পরিবেশবান্ধব কৃষি ফসল উৎপাদন সহায়িকা

প্রক্রিয়াজাত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

পরিবেশবান্ধব কৃষি ফসল উৎপাদন সহায়িকা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

সম্পাদনায়
মোঃ আবু শাহিন
প্রতিষ্ঠান প্রধান ও প্রধান গবেষক, বিআরআইডি

রচনা ও সংকলনে
ড. মোঃ ইয়াসিন প্রধান
পরামর্শক, বিআরআইডি

অর্থায়নে
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০২৩

মুদ্রনে
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

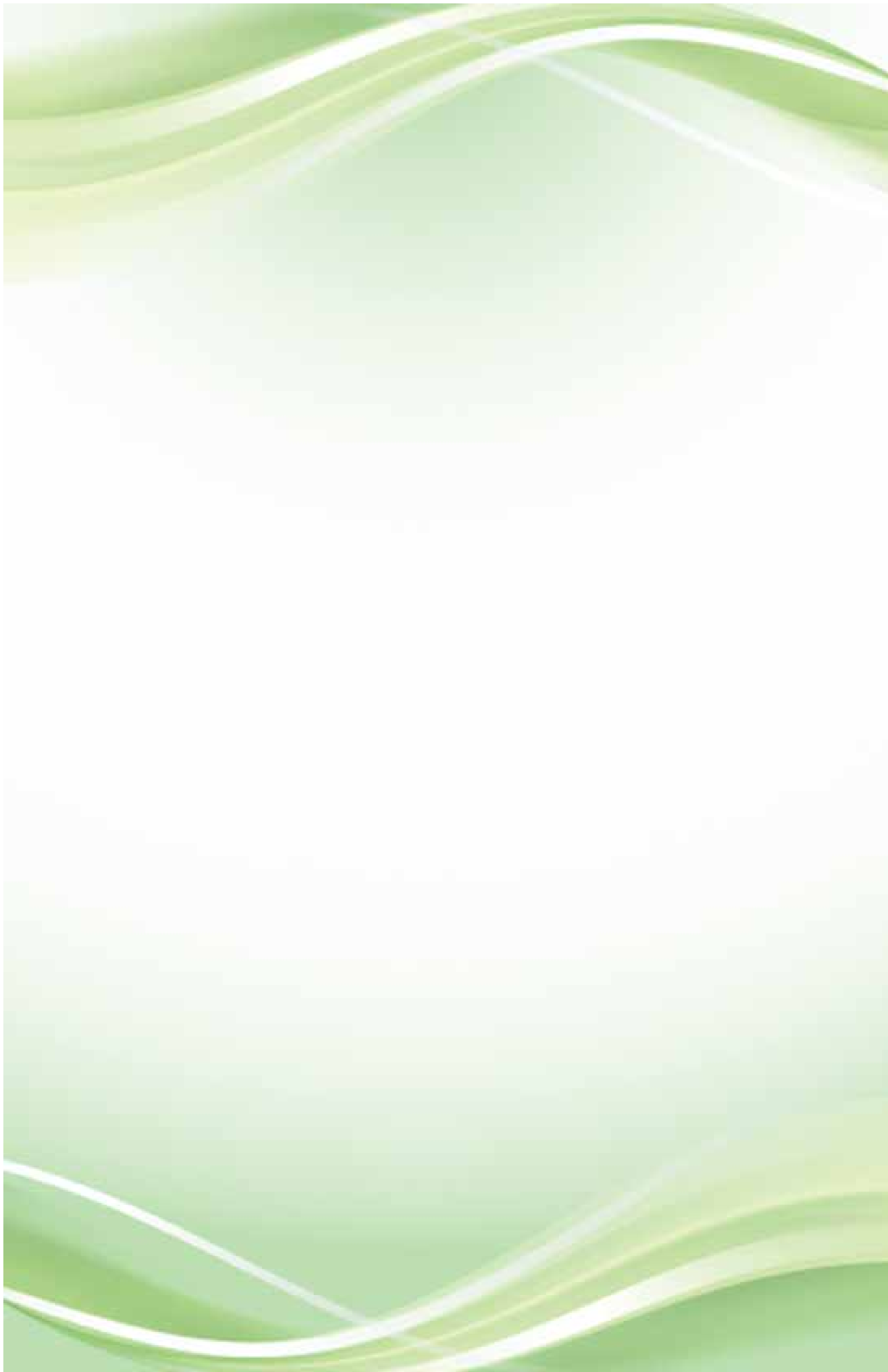

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"প্রক্রিয়াজাত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের অধীনে গ্লোবাল গ্যাপ অনুসরণ করে কৃষি চাষবাদ পদ্ধতি, ফসল কাটা, গ্রেডিং এবং বিপণনের উপর একটি "পরিবেশবান্ধব কৃষি ফসল উৎপাদন সহায়িকা" তৈরি বাংলাদেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ডেভলপমেন্ট (বিআরআইডি)-এর জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ। অপ্রচলিত নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদনকারীদের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাবের আলোকে বিআরআইডি উত্তম কৃষি অনুশীলনের উপর জোর দিয়ে এই হ সহায়িকাটি তৈরি করেছে। নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য GAP সূচকগুলো গৃহীত হওয়ার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য, ক্রমবর্ধমান কৌশল, ফসল কাটা, গ্রেডিং এবং বিপণনের অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদকদের জ্ঞান ও বোধগম্যতা বাড়ানোর জন্যে এই সহায়িকাটি তৈরি করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এই সহায়িকাটি কৃষক ও উৎপাদক পর্যায়ে উত্তম কৃষি চাষাবাদ অনুশীলন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে ও কৃষির আধুনিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিআরআইডি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে এই সহায়িকা লেখনি টিমের প্রধান ড. মোঃ ইয়াসিন প্রধান, সহযোগী অধ্যাপক, বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর-এর প্রতি যার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দিক নির্দেশনা এই সহায়িকাটি তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও পিকেএসএফ ও ইএসডিও-এর মতো প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই সহায়িকাটি তৈরি করা সম্ভব হতো না। বিআরআইডি টিম সেই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে যারা এই কাজটি সফল করতে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। খুব শুরুতেই, আমরা ইএসডিও-এর প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রক্রিয়াজাত ভোগ্য পণ্য সাব-সেক্টরকে বেছে নিয়ে কাজ করার জন্য এমন একটি উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য। তথ্য সরবরাহ এবং এই সহায়িকাটির গুণমান নিশ্চিত করার জন্য ইএসডিও-এর সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট থেকে ফিল্ড স্টাফ পর্যন্ত সকল কর্মীদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সহায়িকাটি লেখার ক্ষেত্রে সৌহার্দ্যপূর্ণ সমর্থন এবং নির্দেশিকা দেওয়ার জন্য প্রকল্পের ফোকাল পারসন এবং প্রকল্প সমন্বয়কারীর উদার সমর্থন স্বীকার করতে পেরে আমরা আনন্দবোধ করছি। সহায়িকা লেখনি টিমের পক্ষ থেকে, আমরা ইএসডিও-এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান-এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তার মূল্যবান পর্যালোচনা, সম্পাদনা এবং প্রতিক্রিয়া প্রদানের মাধ্যমে এই সহায়িকাটি তৈরির কাজে সহযোগিতা করার জন্য। তার মূল্যবান সহযোগিতা ছাড়া এই সহায়িকাটি তৈরি করা সম্ভব হতো না।

মোঃ আবু শাহিন
প্রতিষ্ঠান প্রধান ও প্রধান গবেষক
বাংলাদেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ডেভলপমেন্ট (বিআরআইডি)
ঠাকুরগাঁও-৫১০০, বাংলাদেশ

তারিখঃ জানুয়ারি ২০২৩

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii

পটভূমি ১

গ্লোবাল গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস ২

হ্যান্ডবুকের উদ্দেশ্য ২

এক নজরে প্রক্রিয়াজাত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন উপ-প্রকল্প ২

উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩

সাব-সেক্টরে সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্টতা ৩

বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পের অর্জন ৩

উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণের যৌক্তিকতা ৫

উৎপাদিত পণ্যের বিপণন কৌশল ৬

উপ-প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী ৬

টমেটো ৭

আদা ১০

কলা ১০

সজিনা পাতা ১৬

পপকর্ন ১৮

আখ ২১

তরমুজ ২৩

মরিচ ২৬

পেঁপে 30
ভূট্টা.. ৩৩
ধান ৩৮
সুগন্ধী ধান..৪৩
আলু ৪৯
চালকুমড়া...৫৪
চীনা বাদাম...৫৭
মুগডাল.. ৬৯
মটরশুঁটি ৭৬
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসুত্র ৮০
সহায়িকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ৮১

পটভূমি

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) হচ্ছে সামাজিক ও আর্থিক পরিষেবামূলক একটি সংস্থা। ইএসডিও সঞ্চয় এবং ঋণ পরিচালনার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্যে এবং নিজস্ব সম্পদের সাহায্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পানি ও স্যানিটেশন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব উন্নয়ন, জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষের উন্নয়ন, শিশু শ্রম নিরোধ, পরিবেশের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মসূচি কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকা উন্নয়নসহ নানামুখী কার্যক্রম করে চলেছে। বর্তমানে, ইএসডিও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর প্রোমোশন এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (পেইস) প্রকল্পের দ্বারা সমর্থিত “প্রক্রিয়াজাত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন” শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক খাতগুলোর মধ্যে একটি হলো খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের মূল্য এবং কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা রয়েছে। সমস্ত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসার দ্বারা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি) ২% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা তাদের পণ্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রি করতে পারছে না। যেহেতু বাংলাদেশে একই ধরনের কৃষি পণ্য উৎপাদন করার সময় অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে বেশি ফসল উৎপাদন হয়, তাই এই ফসলের বাজারের চাহিদা কমে যায়, যার ফলে কৃষকদের দাম কম হয় এবং মাঝে মাঝে তাদের ফসলের বাজারের অভাব হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ইএসডিও ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় সারা মৌসুমে উৎপাদিত কৃষি সামগ্রী থেকে প্রক্রিয়াজাত পণ্য তৈরির জন্য "প্রসেসড কনজিউমার গুডস মার্কেট ডেভলপমেন্ট" নামে একটি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্লাস্টার হিসেবে জাতীয়ভাবে পরিচিত। ইকো বানানা চিপস, ইকো সীম বিচি ভাজা, ইকো কাঁঠাল বিচি ভাজা, ইকো মিজলি, ইকো চিড়া ভাজা, ইকো ঝাল মুড়ি, ইকো বাদাম ভাজা, ইকো সজিনা পাতা বিস্কুট ও মটর ভাজা ইত্যাদি ইকো ফুড শিরোনামে আশেপাশের ছোট ব্যবসায়ীদের কারখানায় তৈরি করা হয়। কৃষকরা তাদের পণ্য স্থানীয়ভাবে প্রতিযোগিতামূলক খরচে বিক্রি করতে পারে। এই উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যের কাঁচামাল হল স্থানীয় কৃষিপণ্য। কোভিড-১৯-এর প্রভাবে এই শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয়নি। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য থেকে প্রক্রিয়াজাত ভোক্তা আইটেম তৈরির জন্য বিদ্যমান উপ-প্রকল্পটি সম্প্রসারিত হলেই প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে আরও অবদান রাখবে।

ইএসডিও বৈশ্বিক গ্যাপ এবং কন্ট্রাক্ট ফার্মিং অনুসরণ করে কৃষি পণ্য চাষ, ফসল কাটা, গ্রেডিং, বিপণন ইত্যাদি সিস্টেমের একটি প্রশিক্ষণ মডিউল/সর্বোত্তম অনুশীলন হ্যান্ডবুক তৈরির জন্য একজন স্বতন্ত্র পরামর্শদাতা ফার্মকে নিযুক্ত করে। হ্যান্ডবুকটি উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য করে তৈরি করা হয় যাতে তারা স্ট্যান্ডার্ড GAP, GMP, HACCP মেনে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। স্থানীয় উদ্যোক্তারাও উৎপাদন ও বিপণন কৌশল উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত কমপ্লায়েন্স সিস্টেম বজায় রেখে এবং সনদ প্রাপ্তির মাধ্যমে তাদের পণ্য বাজারজাত করবে।

গ্লোবাল গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস

গ্লোবাল গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস (GGAP) বলতে একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ভালো কৃষি অনুশীলন ও মান নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এটি হলো কৃষির জন্য একটি সার্টিফিকেশন সিস্টেম, নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং অ্যাটেনডেন্ট ডকুমেন্টেশন যা ভোক্তাদের জন্য খাদ্য তৈরি করতে বা টেকসই পদ্ধতি ব্যবহার করে নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর আরও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োগ করা আবশ্যক। যদিও কোন পদ্ধতিগুলো ভাল কৃষি অনুশীলন গঠন করে তার অনেকগুলো প্রতিযোগিতামূলক সংজ্ঞা রয়েছে, যেখানে বেশ কয়েকটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত স্কিম রয়েছে যা উৎপাদকশ্রেণিও মেনে চলতে পারে ।

হ্যান্ডবুকের উদ্দেশ্য

অপ্রচলিত নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদনকারীদের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাবের আলোকে, পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান ভাল কৃষি অনুশীলনের উপর জোর দিয়ে একটি ম্যানুয়াল তৈরি করেছেন। নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য GAP সূচকগুলো গৃহীত হওয়ার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য, ক্রমবর্ধমান কৌশল, ফসল কাটা, গ্রেডিং এবং বিপণনের অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদকদের জ্ঞান ও বোধগম্যতা বাড়ানোর জন্যে এই হ্যান্ডবুকটি তৈরি করা হয়েছে।

এক নজরে প্রক্রিয়াজাত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন উপ-প্রকল্প

বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনের ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি এবং একই সাথে একই ধরনের অনেক বেশি কৃষি ফসল উৎপাদন হয় বলে বাজারে ঐ জাতীয় ফসলের চাহিদা কমে যায় ফলে কৃষকেরা দাম কম পায়, আবার অনেক সময় উৎপাদিত ফসল কৃষক বিক্রয় করতে পারে না। এ অবস্থার নিরসনে মৌসুমে উৎপাদিত কৃষি পণ্য থেকে প্রক্রিয়াজাত পণ্য তৈরি করার লক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় 'প্রক্রিয়াজাত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন' শীর্ষকভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উপ-প্রকল্পটি গ্রহনের ফলে বর্তমানে ঠাকুরগাঁও সদর ফুডের প্রসেসিং ক্লাস্টার হিসেবে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। ইকো ফুডের আওতায়

ইতিমধ্যেই স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ইকো কলার চিপস, ইকো শিম বিচি ভাজা, ইকো কাঁঠাল বিচি ভাঁজা, ইকো মিজলি, ইকো চিরা ভাজা, ইকো ঝাল মুড়ি, ইকো বাদাম ভাজা, ইকো সজিনা পাতা বিস্কুট ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রক্রিয়াজাত ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান (ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও মজুরী শ্রম সৃষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত) উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো-

১. স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত অপ্রচলিত ও প্রচলিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণপূর্বক কৃষি পণ্যের বাজার উন্নয়ন;

২. কন্টাক্ট ফার্মিং সৃষ্টির মাধ্যমে নিরাপদ প্রচলিত ও অপ্রচলিত কৃষি পণ্য উৎপাদন ও গ্রেডিং প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় বিক্রয়;

৩. প্রক্রিয়াজাত ভোগ্য পণ্যের বৈচিত্র্যায়ন ও সনদায়নপূর্বক প্রমোশনাল কর্মকাণ্ড গ্রহনের মাধ্যমে উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি।

সাব-সেক্টরে সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্টতা

ইএসডিও সারাদেশে মোট ৪৯টি জেলার ৪৮৩টি উপজেলায় কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। ইএসডিও পিকেএসএফ-এর সহায়তায় মোট ১৩টি জেলায় মোট ৭০টি উপজেলায় এবং ৪৩৮টি ইউনিয়নের ২৭১৯টি গ্রামে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এই ১৩ টি জেলায় ইএসডিও সংস্থার মোট শাখার সংখ্যা ১১৭টি। মোট ৭৫৫ জন কর্মী এ ঋণ কার্যমের সাথে যুক্ত। ইএসডিও এর মোটসদস্য সংখ্যা ১,২০,১৫৩ জন। মোট ঋণ গ্রহীতা ৯৪,৭৪৩ জন। মোট আউটস্ট্যান্ডিং ১৬১,৮১৬,১,৩৬৮ টাকা। মোট লোন আউটস্ট্যান্ডিং ৪৪০,৭৩,৬৯৭৬৩ টাকা। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) দীর্ঘ ৩০ বছরের বেশি সময়কাল থেকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। অত্র অঞ্চলের জনসাধারনের আস্থা অর্জনের পাশাপাশি ইএসডিও বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং প্রাইভেট সেক্টরের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে যা প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পের অর্জন

দুই বছর মেয়াদি উপ-প্রকল্পটি বিগত ০৭.০১.২০১৯ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ছোট বড় মিলে ৩ শত জন উদ্যোক্তার মাঝে উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৯টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। প্রদর্শনী কারখানাগুলোতে আধুনিক মেশিনারি ব্যবহারের মাধ্যমে ৯ ধরণের পণ্য যেমন- কলার চিপস, শিম বিচি ভাজা, কাঁঠালের বিচি ভাজা, পপ কর্ন, চিড়া

ভাজা, ঝাল মুড়ি, বাদাম ভাজা, সজিনা পাতা বিস্কুট ইত্যাদি উৎপাদন হচ্ছে। বর্তমানে কারখানাগুলোতে উৎপাদিত ৯ লক্ষ প্যাকেট পণ্য ২৪টি ডিলারের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে বিক্রয় হচ্ছে, তবে করোনা মহামারী কেটে গেলে মাসে ৫০ লাখের বেশী পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করা সম্ভব। ইতোমধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠানিক কোম্পানীর সাথে পণ্য বিক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি হয়েছে। স্থানীয়ভাবে ইকোফুড নামে একটি ব্র্যান্ড তৈরি হয়েছে যা জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করেছে। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে শ্রমিকদের দক্ষতা উল্লেখ্যযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মাসিক আয় পূর্বের তুলনায় ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিকদের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের মাসিক আয়ও পূর্বের তুলনায় ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষানবিস কারিগরেরা বিভিন্ন কারখানায় বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে (পূর্বে বেতনভুক্ত ছিল না) এবং মাসিক বেতন পূর্বের তুলনা ২০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পভুক্ত অধিকাংশ কারখানায় স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলাফল দেয়া হলো-

সূচক/লক্ষ্যমাত্রা (মূল লগফ্রেম অনুযায়ী)	বেজলাইনের তথ্যানুযায়ী	কোভিড-১৯ পূর্বের অবস্থা (ফেব্রুয়ারী'২০)	ডিসেম্বর'২০ সময়ের তথ্য	প্রত্যাশিত ফলাফল
৭০ শতাংশ উদ্যোক্তাদের আয় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।	উদ্যোক্তার মাসিক আয় ৩০ হাজার টাকা।	মাসিক গড় আয় ৩৭৫০০ টাকা অর্থাৎ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।	মাসিক গড় আয় ৩৪৫০০ টাকা অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী'২০ হতে ১০ শতাংশ কমেছে।	আয় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে।
শ্রমিকদের আয় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে	কারিগরদের মাসিক আয় ৮ হাজার টাকা।	কারিগরদের মাসিক আয় ১০৮০০ টাকা অর্থাৎ বেসলাইন হতে ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।	কারিগরদের মাসিক আয় ১০০০০ টাকা অর্থাৎ বিগত ফেব্রুয়ারী ২০ হতে ১০ শতাংশ কমেছে। এছাড়া প্রায় ৬০০ জন	বাজার উন্নয়নে কাজ করা হবে ফলে উৎপাদন পূর্বের অবস্থায় চেয়ে ভালো হবে ফলে চাকরিচ্যুত

সূচক/লক্ষ্যমাত্রা (মূল লগফ্রেম অনুযায়ী)	বেজলাইনের তথ্যানুযায়ী	কোভিড-১৯ পূর্বের অবস্থা (ফেব্রুয়ারী'২০)	ডিসেম্বর'২০ সময়ের তথ্য	প্রত্যাশিত ফলাফল
			কারিগর চাকরিচ্যুত হয়েছে।	শ্রমিক চাকুরী পাবে এবং তাদের আয় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।
স্থানীয় কৃষি পণ্যের দাম ২০ শতাংশ বেড়েছে।	ভুট্টা ১৬ টাকা/কেজি, কলার মোচা ২১০ টাকা, সীমের বীচি ৯০ টাকা/কেজি, কাঁঠালের বীচি ১৫ টাকা/কেজি।	বেসলাইন হতে দাম ২০ শতাংশ বেড়েছিল।	দাম বেসলাইনের সমান।	পণ্যের দাম ২০ শতাংশ বাড়বে।

উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণের যৌক্তিকতা

উপ-প্রকল্পের ফ্যাসিলিটেশনে উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে উৎপাদিত ভোগ্য পণ্যের লক্ষ্যভুক্ত ভোক্তা ছিল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ। কোভিড-১৯ এর কারণে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় প্রক্রিয়াজাত পণ্যের বিক্রয় কমে গিয়েছে ফলে উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয়েছে। অনেক উদ্যোক্তা অগ্রসর ঋণের কিস্তি খুব কষ্ট করে ফেরত দিচ্ছেন ফলে তাদের ব্যবসার পরিসর কমে যাচ্ছে। অনেক কারিগর চাকরিচ্যুত হয়েছেন। উপ-প্রকল্পটি সম্প্রসারণ করা হলে করোনাকালে তাদেরকে ব্যবসায়িক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে পণ্যের সনদায়ন ও বিক্রয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের কাযক্রম আরো গতিশীল করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া উদ্যোক্তাদের করোনাকালীন সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পণ্যের বৈচিত্র্যায়ন, উৎপাদন, সনদায়ন ও সেলস প্রমোশন শক্তিশালী করা হলে স্থানীয়ভাবে প্রায় ১৫০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হয়েছিলো।

উৎপাদিত পণ্যের বিপণন কৌশল

'প্রক্রিয়াজাত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে ৯টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কারখানাগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাবহার করে বর্তমানে দৈনিক ৯ লক্ষ প্যাকেট ভোগ্য পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে। উৎপাদিত পণ্যগুলো কারখানার নিজস্ব বাজারজাতকরণ টিম এবং ২৪টি ডিলারের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বিক্রয় হচ্ছে। এছাড়া ৩টি অনলাইন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সাথে পণ্য বিক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে যারা বর্তমানে উৎপাদিত পণ্য গুলো তাদের ই-কমার্স প্লাটফর্মে প্রতিনিয়ত বিক্রয় করছে। প্রক্রিয়াজাতকৃত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যের ব্র্যান্ড উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণে ই-কমার্স ও এফ-কর্মাস উন্নয়ন করা হচ্ছে। উপ-প্রকল্পটির সম্প্রসারিত মেয়াদে বিপণন কৌশলের জন্য উপরোক্ত কর্মকান্ড গ্রহণের ফলে মাসে কমপক্ষে ৫০ লক্ষ প্যাকেটের বেশী পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উপ-প্রকল্পের শুরুতে বিপণন পরিকল্পনা উন্নয়নপূর্বক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উপ-প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী

জেলা	উপজেলা	সদস্যের ধরন	পুরাতন সদস্য	নতুন সদস্য	মোট সদস্য
ঠাকুরগাঁও	সদর	প্রক্রিয়াজাতকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা	১০০	২০০	৩০০
ঠাকুরগাঁও	সদর	কারখানার শ্রমিক	২০০	২৮০০	৩০০০
ঠাকুরগাঁও	সদর	কৃষক/কন্ট্রাক্ট কৃষক	০	১০০০	১০০০
ঠাকুরগাঁও	সদর	সার্ভিস প্রভাইডার	০	২০	২০
ঠাকুরগাঁও	সদর	ডিলার/সাপ্লাইয়ার	০	১৮০	১৮০
মোট সদস্য			৩০০	৪২০০	৪৫০০

টমেটো

টমেটো ভিটামিন সমৃদ্ধ একটি শীতকালীন সবজি। বাংলাদেশে ২০১৬-১৭ সালে প্রায় ২৭৬.৬৬ হাজার হেক্টর জমিতে টমেটো চাষ করা হয় এবং মোট ফলন ৩৮৮৭.২৫ হাজার টন। এতে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন 'এ' এবং ভিটামিন 'সি' রয়েছে। জাতের প্রকারভেদে টমেটোতে সাধারণত ৩০৫ আইইউ ভক্ষণযোগ্য বিটা ক্যারোটিন রয়েছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি

টমেটো এদেশে শীতকালীন ফসল। উচ্চ তাপমাত্রা এবং বাতাসের আর্দ্রতা টমেটো গাছে রোগ বিস্তারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার উচ্চ তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ফুল ঝরে পড়ে। রাতের তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রী সে. এর নিচে থাকলে তা গাছে ফুল ও ফল ধারণের জন্য বেশি উপযোগী। গড় তাপমাত্রা ২০-২৫ ডিগ্রী সে. টমেটোর ভাল ফলনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। আলো-বাতাস যুক্ত উর্বর দোঁআশ মাটি টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। তবে উপযুক্ত পরিচর্যায় বেলে দোঁআশ থেকে এঁটেল দোঁআশ সব মাটিতেই টমেটো ভালো জন্মে। বন্যার পানিতে ডুবে যায় না এমন জমিতে এর ফলন সবচেয়ে ভালো হয়। মাটির অম্লতা ৬ - ৭ পিএইচ হলে ভালো হয়। মাটির অম্লতা বেশি হলে জমিতে চুন প্রয়োগ করা উচিত।

জমি তৈরি

টমেটোর ভালো ফলন অনেকাংশেই জমি তৈরির উপর নির্ভর করে। তাই ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। মাটির প্রকৃতি ও স্থানভেদে ১ মিটার চওড়া ও ১৫-২০ সেমি উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি চওড়া নালা করতে হবে যাতে পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধা হয়।

চারা রোপণ

- চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন অথবা ৪-৬ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে রোপণ করতে হবে।
- এক মিটার চওড়া বেডে দুই সারি করে চারা লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং সারির উপরে চারা থেকে চারা ৪০ সেমি দূরত্বে লাগাতে হবে।
- বীজতলা থেকে চারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ জন্য চারা তোলার আগে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে চারা রোপণ করাই উত্তম এবং লাগানোর পর গোড়ায় হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।

পরবর্তী পরিচর্যা

সেচ ও নিষ্কাশন

চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্ম মৌসুমে টমেটো চাষের জন্য ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষা মৌসুমে তেমন একটা সেচের প্রয়োজন হয় না। টমেটো গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সেচ অথবা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য নালা পরিমিত চওড়া (৩০-৪০ সেমি) এবং এক দিকে মৃদু ঢালু হওয়া বাঞ্ছণীয়।

মালচিং

জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণে মালচিং বিশেষভাবে উপকারী। এটি ব্যবহার করে প্রায় ১০-২৫% আর্দ্রতা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। মালচ উপাদানগুলো হলো ধান বা গমের খড়, কচুরিপানা, গাছের পাতা, শুকনা ঘাস ইত্যাদি। মালচিংয়ের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদার্থ অবশ্যই ৫ সেমি. এর বেশি পুরু করে দেয়া ঠিক নয়।

আগাছা দমন

টমেটোর জমিকে প্রয়োজনীয় নিড়ানি দিয়ে আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

বিশেষ পরিচর্যা

১ম ফুলের গোছার ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে। গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে।

শস্য সংগ্রহ

প্রথমেই টমেটো গাছ হতে সংরক্ষণ করে ঠান্ডা শুষ্ক ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। টমেটো পরিবহনের জন্য প্লাস্টিক ক্যারেট ব্যবহার করা উত্তম। তবে প্লাস্টিক ক্যারেটের ধারালো অংশ হতে টমেটোকে রক্ষা করার জন্য নরম পরিচ্ছন্ন কাগজ, কাপড় বা ফোম ব্যবহার করা যেতে পারে। টমেটোর রাখার পাত্র কোনভাবেই মাটির সংস্পর্শে রাখা যাবে না। এর ফলে অন্য পাত্রের টমেটো সংক্রমণে সহায়ক হতে পারে।

গ্রেডিং

টমেটোর গ্রেডিং-এর জন্য প্রয়োজনীয়তাঃ

১. রোগমুক্ত ফল
২. পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ থেকে মুক্ত ফল
৩. পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ফল

বাজারজাতকরণ

নিরাপদ কৃষি পণ্য (টমেটো) প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সরবরাহের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাধীন ফারাবাড়ী বাজারে উন্নয়নকৃত নির্ধারিত নিরাপদ কৃষিপণ্য কালেকশান পয়েন্টে ন্যায্য দামে কন্ট্রাক্ট ফার্মার গন বিক্রয় করতে পারবে। অপরদিকে সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার লোকজন এসে নিরাপদ কৃষি পণ্য (টমেটো) প্রক্রিয়াজাতকরনের উদ্যেশ্যে সঠিক দামে ক্রয় করে নিয়ে যাবে।

গ্রেড	ফলের ওজন (গ্রাম)
ছোট	< ১০০
মাঝারি	১০০-২৫৫
বড়	> ২৫৫

আদা

আদা বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী মসলা ফসল হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সুদূর অতীত থেকে আদা মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি কাঁচা, শুকনা ও সংরক্ষিত অবস্থায় খাওয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন ঔষধি গুণ সম্পন্ন এই ফসল ব্যথানাশক, প্রদাহ, বাতরোগ, ডায়াবেটিস, রক্তের কোলেস্টেরল কমানো, অন্ত্রের রোগ ও সর্দি কাশি প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য তৈরির ক্ষেত্রে আদা একটি অন্যতম উপাদান। কাঁচা আদায় শতকরা ২.৩ ভাগ প্রোটিন, ১২.৩ ভাগ শ্বেতসার, ১.০-৩.০০ ভাগ উদ্বায়ী তেল, ২.৪ ভাগ আঁশ, ১.২ ভাগ খনিজ পদার্থ, ৮০.৮ ভাগ পানি, রেজিন ইত্যাদি উপাদান বিদ্যমান। বাংলাদেশের কৃষক পর্যায়ে আদার গড় ফলন ৮.৫.০ টন/হেক্টর। যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। দেশে প্রতি বৎসর আদার চাহিদা ২.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রতি বছর গড়ে ৯ হাজার হেক্টর জমিতে ৭৭ হাজার মেট্রিক টন আদা উৎপন্ন হয়, যা চাহিদার তুলনায় কম (বিবিএস ২০১৫-১৬)। ফলন কম হওয়ার মূল কারণ উন্নত ফলনশীল জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির অভাব। আদার ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে মসলা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীবৃন্দ কয়েক বৎসর যাবত গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে বাছাইকরণের মাধ্যমে বারি আদা-২ ও বারি আদা-৩ নামে ৩টি উচ্চ ফলনশীল আদার জাত উদ্ভাবন করেছেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উষ্ণ অঞ্চল আদার উৎপত্তি স্থান। বাংলাদেশের লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় আদার চাষ করা হয়। এছাড়া ভারত, চীন, বার্মা, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, জ্যামাইকা, নাইজেরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, সিওরালিওন, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশে আদার ব্যাপক চাষ হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

আবহাওয়া জলবায়ু

আমাদের দেশে আদার উৎপাদনকাল সমগ্র খরিফ মৌসুমব্যাপী বিস্তৃত। আদার জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া দরকার। অল্প ছায়াযুক্ত স্থানে আদা ভাল হয়। আদা রোপণের পরপরই গজানোর জন্য মাটিতে যথেষ্ট রস থাকা দরকার। তাই রোপণের পর বৃষ্টিপাত না হলে জমিতে সেচ প্রদান করতে হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ১৫০০ মিটার উঁচু পার্বত্য অঞ্চলেও আদা চাষ করা যায়। আদার জন্য বাৎসরিক ৩,০০০ মি.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। আদা ২৮-৩৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় চাষাবাদ করা যায় তবে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রী সে. এর নিচে নেমে গেলে আদা গাছ মারা যায়।

মাটি

ঊর্বর দোআঁশ মাটি আদা চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো। তবে বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটিতেও আদা চাষ করা যায়। এঁটেল দোআঁশ মাটিতে চাষ করতে হলে পানি নিষ্কাশনের খুব ভালো ব্যবস্থা থাকতে হবে। জমিতে পানি বেঁধে থাকলে আদা পচে নষ্ট হয়ে যায়।

বীজ রোপণ সময়

এপ্রিল মাসের প্রথম-দ্বিতীয় সপ্তাহে রোপণকৃত বারি আদা-২ ও আদা-৩ থেকে ফলন সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। আদা মে মাস পর্যন্ত রোপণ করা যায়। গাছের দৈহিক বৃদ্ধির ৩-৪ মাস পর রাইজম উৎপন্ন হয়। তাই দেরিতে রোপণকৃত আদা গাছের বৃদ্ধি যথাযথ না হওয়ার কারণে ফলন কম হয়।

জমি শোধন

আদা গাছে কাণ্ড পচা রোগের আক্রমণ সবচেয়ে বেশি। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য মাটি শোধন করতে হয়। মাটি শোধনের কয়েকটি পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো। নিম খৈল প্রতি শতকে ২ কেজি হারে প্রয়োগ করে মাটি শোধন করা যায়। ফুরাডান প্রতি বিঘায় ২-২.৫ কেজি হারে প্রয়োগ করে মাটি শোধন করা যায়। আদা লাগানোর ১৫-২০ দিন পূর্বে জমি ভালভাবে চাষ দিয়ে মাটি আলগা করে মাটির উপরে ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া স্তর আকারে বিছিয়ে তাতে আগুন দিয়ে মাটি শোধন করা যায়।

জমি তৈরি

মার্চ-এপ্রিল মাসে বৃষ্টি হওয়ার পর জমিতে যখন ‘জো’ আসে তখন ৬-৮ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করা হয়। এরপর ১.৫ মিটার প্রস্থ এবং ৪ মিটার দৈর্ঘ্যের বা জমির আকার অনুযায়ী দৈর্ঘ্যের বেড তৈরি করে নিয়ে চারিদিকে ১-১.৫ ফুট গভীর নালা করে নালার মাটি বেডের উপর দিয়ে বেডকে উঁচু করতে হবে। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য দুটি বেডের মাঝখানে ৫০ সেমি প্রশস্ত নালা রাখতে হবে।

বীজের আকার ও বীজহার

ফলন বীজের আকারের উপর নির্ভর করে। এজন্য ২৫-৫০ গ্রাম পর্যন্ত বীজ লাগানো যায়। তবে আর্থিক ও প্রাপ্যতার বিবেচনায় গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে যে ৪০-৪৫ গ্রাম আকারের বীজ আদা রোপণ করলে লাভজনক ফলন পাওয়া যায়। এ আকারের বীজ ব্যবহার করলে হেক্টর প্রতি ২৮০০-৩০০০ কেজি আদার দরকার হয়।

বীজ শোধন

বীজের মাধ্যমে আদা সংক্রমিত হয় বিধায় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আদা বীজ শোধন করতে হবে। এ জন্য ৭৫-৮০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ বা অন্য কোন ছত্রাকনাশক ঔষধ মিশিয়ে তার মধ্যে ১০০ কেজি আদা বীজ ৩০-৪০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর উক্ত বীজ আদা উঠিয়ে ছায়াযুক্ত জায়গায় শুকাতে হবে এবং তারপর জমিতে রোপণ/লাগাতে হবে। আদা বীজ জমিতে লাগানোর পূর্বে ঝুড়িতে বিছিয়ে তার উপর খড়/চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখলে কয়েকদিনের মধ্যে ভ্রূণ বের হয়। এ রকম গাজানো আদা বীজ থেকে দ্রুত আদার গাছ জন্মায়।

বীজ রোপণ

বারি আদা-১ এর বীজ দুইভাবে রোপণ করা যায় যেমন- বহুসারি পদ্ধতি ও একক সারি পদ্ধতি। বহুসারি পদ্ধতিতে আদা বীজ বেডে সারি থেকে সারি ৩০ সেমি দূরত্বে এবং রাইজম/কন্দ থেকে কন্দ ২৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করা হয়। একক সারি পদ্ধতিতে বীজ আদা সরু লাঙ্গল বা রো-কোদাল দিয়ে ৫০-৬০ সেমি দূরে দূরে ৫-৬ সেমি গভীর করে সারি তৈরি করে এতে ২৫-৩০ সেমি দূরত্বে বীজ আদা লাগাতে হয়। সারিতে বীজ আদা লাগানোর সময় বীজের অঙ্কুরিত মুখ একইদিকে রাখতে হয় রোপণের ৭৫-৯০ দিন পর সারির এক পার্শ্বের মাটি সরিয়ে সহজেই পিলাই সংগ্রহ করা যায়। এভাবে পিলাই আদা সংগ্রহ করে বিক্রি করলে বীজের খরচ ৫০-৬০ ভাগ উঠে আসে।

শস্য সংগ্রহ

রাইজোম রোপণের ৯-১০ মাস পর পরিপক্ক ফসলের পাতা এবং গাছ হলুদ রঙের হয়ে শুকিয়ে যায়। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করে আদা উত্তোলন করা হয়। ফসল সংগ্রহের পর শিকড় ও মাটি পরিষ্কার করে আদা গুদামজাত করা হয়।

বাজারজাতকরণ

নিরাপদ কৃষি পণ্য আদা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সরবরাহের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাধীন কেন্দ্রীয় আরত বাজারে উন্নয়নকৃত নির্ধারিত নিরাপদ কৃষিপণ্য কালেকশান পয়েন্টে ন্যায্য দামে কন্ট্রাক্ট ফার্মার গন বিক্রয় করতে পারবে। অপরদিকে সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার লোকজন এসে নিরাপদ কৃষি পণ্য (আদা) প্রক্রিয়াজাতকরনের উদ্যেশ্যে সঠিক দামে ক্রয় করে নিয়ে যাবে।

কলা

উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন ফলের মধ্যে কলা একটি উৎকৃষ্ট ফল। কলা বাংলাদেশের প্রধান ফল যা সারা বছর পাওয়া যায় এবং সকলেই খাওয়ার সুযোগ পায়। বগুড়া, যশোর, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপকভাবে কলার চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৪৯ হাজার হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় এবং বার্ষিক মোট উৎপাদন ৮.০৭ লক্ষ মে. টন। কলার হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫.৬০ টন। কলা ক্যালরি, খাদ্যপ্রাণ, খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ ও সুগন্ধী এবং পুষ্টিকর ফল। কলার ফলন অন্যান্য ফল ও ফসল অপেক্ষা অনেক বেশি। ধান, গম ও মিষ্টি আলুর চাষ করে প্রতি হেক্টরে যেখানে ১১.২, ৬.৬ ও ৩৯.৮ লক্ষ কিলো ক্যালরি খাদ্য-শক্তি উৎপন্ন হয় সেখানে কলা থেকে প্রায় ৫০.০ লক্ষ কিলো ক্যালরি পাওয়া যায়। কলার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে সারা বছরই উৎপন্ন হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

পর্যাপ্ত রোদযুক্ত ও পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা সম্পন্ন উঁচু জমি কলা চাষের জন্য উপযুক্ত। উর্বর দোআঁশ মাটি কলা চাষের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি ও গর্ত খনন

জমি ভালভাবে গভীর করে চাষ করতে হয়। দেড় থেকে দুই মিটার দূরে দূরে ৬০×৬০×৬০ সেমি আকারের গর্ত খনন করতে হয়। চারা রোপণের মাস খানেক আগেই গর্ত খনন করতে হয়। গর্তে গোবর ও টিএসপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখতে হবে।

রোপণের সময়: কলার চারা বছরে ৩ মৌসুমে রোপণ করা যায়।

প্রথম রোপণ

আশ্বিন-কার্তিক (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য নভেম্বর)।

দ্বিতীয় রোপণ

মাঘ-ফাল্গুন (মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য মার্চ)।

তৃতীয় রোপণ

চৈত্র-বৈশাখ (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য মে)।

চারা রোপণ

রোপণের জন্য অসি তেউড় (Sword sucker) উত্তম। অসি তেউড়ের পাতা সরু, সুচালো। অনেকটা তলোয়ারের মত, গুড়ি বড় ও শক্তিশালী এবং কাণ্ড ক্রমশ গোড়া থেকে উপরের দিকে সরু হয়। তিন মাস বয়স্ক সুস্থ সবল তেউড় রোগমুক্ত বাগান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত খাটো জাতের গাছের ৩৫-৪৫ সেমি ও লম্বা জাতের গাছের ৫০-৬০ সেমি দৈর্ঘ্যের তেউড় ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া টিস্যু কালচার চারা ব্যবহার করা হলে বাড়তি কিছু সুবিধা পাওয়া যায়।

কলা গাছে সার প্রয়োগ

চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। বয়স ভিত্তিতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

সারের নাম	গাছ প্রতি সারের পরিমাণ
গোবর	১০ কেজি
ইউরিয়া	৫০০ গ্রাম
টি এস পি	৪০০ গ্রাম
এম ও পি	৬০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	১.৫ গ্রাম
বরিক এসিড	২.০ গ্রাম

প্রয়োগ পদ্ধতি

সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বরিক এসিড এবং অর্ধেক এমওপি সার গর্ত তৈরির সময় মাটির সাথে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও বাকি অর্ধেক এমওপি সার চারা রোপণের ২ মাস পর থেকে ২ মাস পর পর ৩ বারে এবং ফুল আসার পর আরও একবার গাছের চর্তুদিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। সার দেয়ার সময় জমি হালকাভাবে কোপাতে হবে যাতে শিকড় কেটে না যায়। জমির আর্দ্রতা কম থাকলে সার দেয়ার পর পানি সেচ দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

শস্য সংগ্রহ

ঋতুভেদে রোপণের ১০-১৩ মাসের মধ্যে সাধারণত সব জাতের কলাই পরিপক্ক হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করলে কলার গায়ের শিরাগুলো তিন-চতুর্থাংশ পুরো হলেই কাটতে হয়। তাছাড়াও কলার অগ্রভাগের পুষ্পাংশ শুকিয়ে গেলে বুঝতে হবে কলা পুষ্ট হয়েছে। সাধারণত মোচা আসার পর ফল পুষ্ট হতে ২১/২- ৪ মাস সময় লাগে। কলা কাটানোর পর কাঁদি শক্ত জায়গায় বা মাটিতে রাখলে কলার গায়ে কালো দাগ পড়ে এবং কলা পাকার সময় দাগওয়ালা অংশ তাড়াতাড়ি পচে যায়।

বাজারজাতকরণ

নিরাপদ কৃষি পণ্য (কলা) প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সরবরাহের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাধীন দিলদার ফুড প্রডাক্ট, সালন্দর (তেলীপাড়া) উন্নয়নকৃত নির্ধারিত নিরাপদ কৃষিপণ্য কালেকশান পয়েন্টে ন্যায্য দামে কন্ট্রাক্ট ফার্মার গন বিক্রয় করতে পারবে। অপরদিকে সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার লোকজন এসে নিরাপদ কৃষি পণ্য (কলা) প্রক্রিয়াজাতকরনের উদ্যেশ্যে সঠিক দামে ক্রয় করে নিয়ে যাবে।

সজিনা পাতা

সজিনা মাঝারি আকৃতির পত্রঝরা বৃক্ষ, ৭-১০ মিটার উঁচু হয়। এর বাকল ও কাঠ নরম। যৌগিক পত্রের পত্রাক্ষ ৪০-৫০ সে.মি. লম্বা হয়। এতে ৬-৯ জোড়া ১-২ সে.মি. লম্বা বিপরীতমুখী ডিম্বাকৃতি পত্রক থাকে। ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে সজিনা গাছে ফুল আসে। মুকুল ডাঁটাগুলো বিস্তৃত, গুচ্ছবদ্ধ ও ৫-৮ সে.মি. লম্বা। মিষ্টি গন্ধে সবুজের আভাযুক্ত সাদা ফুল ২-৩ সে.মি. ব্যাসের হয়। লম্বা সবুজ বা ধূসর বর্ণের সজিনা ফল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এক একটি ফল ৯টি শিরাযুক্ত ২২-৫০ সে.মি. বা কখনো কখনো এর বেশী লম্বা হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বীজ সংগ্রহের সময়

এপ্রিল-জুন মাস বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

বীজের সংখ্যা

প্রতি কেজিতে ১২০০-২০০০টি বীজ পাওয়া যায়।

বংশবিস্তার

প্রতিটি লম্বা সজিনা ফলে ১০-১৫টি বীজ থাকে, এগুলো তিন শিরাবিশিষ্ট এবং ত্রিভূজাকৃতির। বীজ থেকে বংশবিস্তার সম্ভব হলেও অঙ্গজ বা কাটিং থেকে নতুন চারা তৈরী করাই সহজ এবং উত্তম। সিড বেডে কাটিং দিলে ২ সপ্তাহের মধ্যে কুশি গজায় এবং শতকরা ৯০টি নতুন চারা পাওয়া যায়। এক বছর বয়সী কাটিং চারা রোপণের জন্য উত্তম। উষ্ণ ও আর্দ্র পলিমাটি সজিনা গাছের জন্য উপযুক্ত।

শস্য সংগ্রহ

যখন সজিনা গাছ থেকে ফল পাড়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে তখন গাছ থেকে হাত বা লাঠি দিয়ে সজিনা পেড়ে নিতে হবে

বাজারজাতকরণ

নিরাপদ কৃষি পণ্য (সজিনা পাতা) প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সরবরাহের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাধীন ডেইলী ফ্রেস বেকারী, মুসলিমনগর, গড়েয়া রোড, ঠাকুরগাঁও উন্নয়নকৃত নির্ধারিত নিরাপদ কৃষিপণ্য কালেকশান পয়েন্টে ন্যায্য দামে কন্ট্রাক্ট ফার্মার গন বিক্রয় করতে পারবে। অপরদিকে সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার লোকজন এসে নিরাপদ কৃষি পণ্য (সজিনা পাতা) প্রক্রিয়াজাতকরনের উদ্যেশ্যে সঠিক দামে ক্রয় করে নিয়ে যাবে।

পপকর্ন

পপকর্ন একটি অধিকতর ফলনশীল দানা শস্য। পপকন গ্রামিনী গোত্রের ফসল। একই গাছে পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল জন্মে। পুরুষ ফুল একটি মঞ্জুরী দণ্ডে বিন্যস্ত হয়ে গাছের মাথায় বের হয়। স্ত্রী ফুল গাছের মাঝামাঝি উচ্চতায় কাণ্ড ও পাতার অক্ষকোণ থেকে বের হয়। পপকর্নের ফল মঞ্জুরীকে মোচা বলে। মোচার ভিতরে দানা সৃষ্টি হয়। পপকর্নর দানা ক্যারিওপসিস জাতীয় ফল। এতে ফলত্বক ও বীজত্বক একসাথে মিশে থাকে। তাই ফল ও বীজ আলাদা করে চেনা যায় না। ধান ও গমের তুলনায় পপকর্নের পুষ্টিমান বেশি। এতে প্রায় ১১% আমিষ জাতীয় উপাদান রয়েছে। পপকর্নের আমিষে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো এসিড যথা- ট্রিপটোফেন ও লাইসিন অধিক পরিমাণে আছে। এছাড়া হলদে রঙের প্রতি ১০০ গ্রাম পপকর্ন দানায় প্রায় ৯০ মিলিগ্রাম ক্যারোটিন থাকে। পপকর্নের দানা মানুষের খাদ্য হিসেবে এবং ভুট্টার গাছ ও সবুজ পাতা উন্নত মানের গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমানে ৪.৪৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৩৮.১৮ লক্ষ টন পপকর্ন উৎপাদিত হচ্ছে। পপকর্নের জাত সংগ্রহ, সংকরায়ন ও বাছাইকরণের মাধ্যমে বিএআরআই এ পর্যন্ত ৯টি মুক্ত পরাগায়িত জাত এবং ১৬টি হাইব্রিড ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী পপকর্ন জাতের চাষের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি চাষের জন্য উপযোগী। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমিতে পানি জমে না থাকে।

বপনের সময়

বাংলাদেশে রবি মৌসুমে মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর) এবং খরিফ মৌসুমে ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ) পর্যন্ত সময় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের হার ও বপন পদ্ধতি

শুভ্রা, বর্ণালী ও মোহর জাতের পপকর্নের জন্য হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ কেজি হাইব্রিড পপকর্নের বীজ হেক্টর প্রতি ২০-২২ কেজি এবং খৈ পপকর্নের জাতের জন্য ১৫-২০ কেজি হারে বীজ বুনতে হয়। বীজ সারিতে বুনতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেমি। সারিতে ২৫ সেমি দূরত্বে ১টি অথবা ৫০ সেমি দূরত্বে ২টি গাছ রাখতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে অনুমোদিত ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে জমি চাষ ও মই দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমান ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বীজ গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর (৮-১০ পাতা পর্যায়) এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ গজানোর ৬০-৬৫ দিন পর (পুরুষ ফুল আসা পর্যায়) উপরি প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ৩০ দিনের মধ্যে জমি থেকে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে। চারার বয়স এক মাস না হওয়া পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ প্রয়োগ পদ্ধতি

উচ্চ ফলনশীল জাতের পপকর্নের আশানুরূপ ফলন পেতে হলে রবি মৌসুমে সেচ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। উদ্ভাবিত জাতে নিম্নরূপ ৩-৪টি সেচ দেওয়া যায়।

প্রথম সেচ: বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (৩-৫ পাতা পর্যায়)।

দ্বিতীয় সেচ: বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে (৮-১০ পাতা পর্যায়)।

তৃতীয় সেচ: বীজ বপনের ৬৫-৭০ দিনের মধ্যে (পুরুষ ফুল আসা পর্যায়)।

চতুর্থ সেচ: বীজ বপনের ৯০-৯৫ দিনের মধ্যে (দানা বাঁধার পূব পর্যায়)।

তবে বীজ বপনের সময় মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে বপনের পরপরই একটি হালকা সেচ দিতে হবে, সেক্ষেত্রে প্রথম সেচ ৩০ দিনের মধ্যে দিলেও চলবে। ভুট্টার ফুল ও দানা বাঁধার সময় কোন ক্রমেই জমিতে যাতে পানির স্বল্পতা এবং জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

শস্য সংগ্রহ

হাইব্রিড পপকর্নের মাঠ হতে সংগৃহীত দানা বীজ হিসেবে পরবর্তী বছরের জন্য কোন অবস্থাতেই সংরক্ষণ করা যাবে না। তবে মুক্ত পরাগায়িত জাতের ভুট্টার বীজ সঠিক নিয়ম মেনে লাগানো হলে বীজ হিসেবে পরবর্তী বছরে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা যাবে। মোচা সংগ্রহের সময় বীজে বা দানায় সাধারণত ২৫-৩৫% আর্দ্রতা থাকে। তাই সংরক্ষণের আগে দানা এমনভাবে শুকাতে হবে যেন আর্দ্রতা ১২% এর বেশি না থাকে। দানার জন্য ভুট্টা সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোচা চকচকে খড়ের রং ধারণ করলে এবং পাতা কিছুটা হলদে হলে সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হয়। মোচার দানার গোড়ায় কালো দাগ দেখা গেলে ও মোচার উপরের আবরণ সম্পূর্ণ খড়ের রং ধারণ করলে এবং গাছের পাতা কিছুটা হলদে হয়ে এলে ভুট্টার মোচা সংগ্রহ করতে হবে। শুষ্ক আবহাওয়া ও রোদের দিন ভুট্টা সংগ্রহ করা উচিত। যদি বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার জন্য মোচা সংগ্রহ সম্ভব না হয় তাহলে পাকা মোচার কিছুটা নিচের দিকে গাছ আলতো করে ভেঙ্গে গাছের মাথাসহ মোচা মাটির দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এতে বৃষ্টির পানি মোচার ভিতর ঢুকতে পারবে না। পরে রোদ হলে মোচা সংগ্রহ করতে হবে।ক্ষেত হতে মোচা বাড়িতে এনে ছায়ায় ঠাণ্ডা ও শুকনা স্থানে চাটাইয়ের উপর বিছিয়ে রাখতে হবে এবং খুব দ্রুত মোচার খোসা ছড়িয়ে নিয়ে ৩-৪ দিন চাটাইয়ের উপর মোচা বিছিয়ে ভালভাবে রোদে শুকাতে হবে।

সংরক্ষণ ব্যবস্থা

পপকর্নের দানা গোলাজাতের পূর্বে ৪-৫ দিন রোদে ভালভাবে শুকাতে হবে। দাঁত দিয়ে চাপ দিলে যদি ভুট্টা দানা “কট” শব্দ করে ভেঙ্গে যায়, তাহলে বুঝতে হবে দানা গোলাজাতের উপযোগী হয়েছে। ঘরের মেঝেতে চাটাইয়ের উপর ভুট্টা দানা ১০-১২ ঘণ্টা ঠাণ্ডা করে নিয়ে গোলাজাত করতে হবে। পরিষ্কার ও ছিদ্রমুক্ত ড্রামে অথবা মোটা পলিথিন দেয়া চটের বস্তায় দানা এমনভাবে ভরতে হবে যেন ভেতরে খালি জায়গা না থাকে। বস্তা ও ড্রামের মুখ বন্ধ করে ঘরের মেঝেতে বাঁশ বা কাঠের পাটাতনের উপর রাখতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা না হলে গোলাজাত ভুট্টা দানার বিভিন্ন পোকা যেমন- কাটুই পোকা, মাজরা পোকা, শুঁড় পোকা, সুরুই পোকা, চালের শুড় পোকা ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

বাজারজাতকরণ

নিরাপদ কৃষি পণ্য (পপকর্ন) প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সরবরাহের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাধীন দিলদার ফুড প্রডাক্ট, সালন্দর (তেলীপাড়া) উন্নয়নকৃত নির্ধারিত নিরাপদ কৃষিপণ্য কালেকশান পয়েন্টে ন্যায্য দামে কন্ট্রাক্ট ফার্মার গন বিক্রয় করতে পারবে। অপরদিকে সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার লোকজন এসে নিরাপদ কৃষি পণ্য (পপকর্ন) প্রক্রিয়াজাতকরনের উদ্যেশ্যে সঠিক দামে ক্রয় করে নিয়ে যাবে।

আখ

পুষ্টিমান

শরীরে প্রোটিনের মাত্রা বাড়লে কিডনির স্বাস্থ্য ভাল রাখে। আখের রসে পটাশিয়াম আছে যা হজমে সাহায্য করে। তাছাড়া অন্যান্য পুষ্টিগুণ যেমন- খনিজ পদার্থ, আঁশ, খাদ্যশক্তি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি-২ ও শর্করা ইত্যাদি রয়েছে ।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটির বর্ণনা

উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত দো-আঁশ বা কাদা দো-আঁশ মাটি ও সমতল ভূমি নির্বাচন করতে হবে। যেখানে এক মাসের বেশি বৃষ্টির পানি বা বন্যার পানি জমে থাকে এমন নিচু জমি, বালি মাটি বা জলাবদ্ধ মাটি নির্বাচন করা যাবে না।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ

আখ দুই ভাবে চাষ করা যায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে এবং রোপা পদ্ধতিতে। প্রচলিত পদ্ধতিতে সরাসরি বীজখন্ড মাঠে বপন করে আখ উৎপাদন করার পদ্ধতিই প্রচলিত পদ্ধতি।

ভালো বীজ নির্বাচন

বীজ আখ মূল জমিতে রোপণের আগে ৪৭ ইঞ্চি, ৩-১০মিটার লম্বা ও ৪-৫ ইঞ্চি উঁচু বীজ তলা তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে ১টন জৈব সার দেয়া ভালো। বীজতলায় খন্ডগুলো পাশাপাশি এবং চোখগুলো উপরের দিকে রাখতে হবে এবং ১ ইঞ্চি মাটি দিয় ঢেকে দিতে হবে।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ

সাধারণত তিন চোখবিশিষ্ট ইক্ষুবীজ ব্যবহারের মাধ্যমে এ পদ্ধতিতে ইক্ষু চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রায় ৩০-৪০% অংকুরোদগম হয়। রোপা পদ্ধতিতে আখ চাষ

প্রচলিত পদ্ধতি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। এ পদ্ধতিতে রোপা ধানের মত বিভিন্ন পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করে সেই চারা মূল জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করা হয়।

বীজতলা পরিচর্চা

ইক্ষু চাষের জন্য ৮ ইঞ্চি গভীর করে জমি চাষ দিতে হবে। বেশি ভেজা বা বেশি শুকনো কোন জমিই জমি তৈরির জন্য উপযুক্ত নয়।

শস্য সংগ্রহ

ফসল তোলা

সাধারণত আখ রোপনের উপর কর্তন নির্ভর। আশ্বিন-ফাল্গুন/ চৈত্র মাসের মাঝামাঝিতে আখ কাটতে হয়। চিবিয়ে খাওয়া আখের ক্ষেত্রে নভেম্বর/ডিসেমম্বর মাসে কর্তন করতে হয়। যত দূর সম্ভব মাটি বরাবর ধারালো হাসুয়া দিয়ে আখ কেটে শিকড়, চোখ পাতা কেটে আঁটি বাঁধতে হয়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ

মিলে আখ মাড়াই করে রস জ্বাল দিয়ে গুড় হিসেবে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। স্থানীয়ভাবে রস করে বা চিবিয়ে খাওয়া হয়।

সংরক্ষণ

আঁটি বেঁধে বা প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করা।

গ্রেডিং

১.বড় সাইজের আখগুলোকে আলাদা করে নিতে হবে।

২.রোগাক্রান্ত বা ছোট সাইজের আখগুলোকে আলাদা করে নিতে হবে।

৩. অধিক পরিমাণ লাভের জন্য বড় এবং স্বাস্থ্যবান আখ গুলোকে বাজারজাত করতে হবে ।

বাজারজাতকরণ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থাঃ মাথায় করে/ ঠেলাগাড়ি/ নৌকা।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থাঃ ট্রলি, ভেন গাড়ি, ট্রাক, রেলের ওয়াগন।

প্রথাগত বাজারজাতকরণ

চিবিয়ে খাবার আখ আঁটি বেঁধে স্থানীয় বাজারে/রস করে মোকামে এবং চিনির আখ চুক্তিবদ্ধ চাষি সরাসরি মিলে / বিক্রয় কেন্দ্রে বাজারজাত করে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাতকরণ

গুড়ের আড়তে/ হাটবাজারে হাঁড়ি/ মটকা/ টিনের পাত্রে; এবং চিনি চটে, পলি ব্যাগে, নানা আকারের পাত্রে বাজারজাত করা হয়।

তরমুজ

পুষ্টিমান

তরমুজে ১১ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম রয়েছে। তাছাড়া জলীয় অংশ ৯৫.৮ গ্রাম, খনিজ পদার্থ, শর্করা ৩.৩ গ্রাম, খাদ্য শক্তি ১৬ কিলোক্যালরি, ফসফরাস, ভিটামিন বি ১ এবং ভিটামিন সি রয়েছে।

তরমুজ গ্রীষ্মকালের জনপ্রিয় ফল। আয়তকার, সবুজ রঙের রসালো ফল।

জমি নির্বাচন

মাঝারি উচু, মাঝারি নিচু জমি, অতি নিচু জমি

মাটি নির্বাচন

বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ।

উৎপাদন প্রযুক্তি

একটি আদর্শ বীজতলার পরিমান ১ মি. প্রস্থ এবং ৩ মি. দৈর্ঘ্য। কিন্তু তরমুজের জন্য পলিব্যগে অথবা বীজতলায় চারা তৈরি করা হয়।

ভাল বীজ নির্বাচন

উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ বিশ্বস্ত বীজ বিক্রেতার নিকট হতে বায়ু নিরোধ প্যাকেটে রক্ষিত বীজ ক্রয় করতে হবে।

১। উন্নত জাতের রোগ বালাই মুক্ত মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২। বীজ বিশুদ্ধ হতে হবে এবং গজানোর ক্ষমতা ৮০% এর বেশি থাকতে হবে।

৩। সরকার অনুমোদিত ডিলারদের থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় ক্রয় রশিদ গ্রহণ করতে হবে।

৪। বাজারের খোলা বীজ কেনা যাবে না।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ

৫০ ভাগ মাটি ও ৫০ ভাগ পঁচানো গোবর ভালো করে মিশিয়ে ছাঁকানি দ্বারা ছেকে নিয়ে, সেভিন ডাস্ট দ্বারা মাটি জীবাণুমুক্ত করে পলিব্যাগে ভরে প্রতি ব্যাগে ১ টি বীজ বপন করতে হবে।

বীজতলা পরিচর্চা

১। বীজ বপনের পর ছালার চট বা ধানের খড় বিছিয়ে ৭২ ঘন্টা বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে এবং বীজ গজানো তরান্বিত করার জন্য ঝাঝরা দিয়ে পানি দিতে হবে।

২। অতিরিক্ত ঠান্ডা হলে রাতে বীজতলা পলিথিন দিয়ে ডেকে রাখতে হবে এবং সকালে খুলে দিতে হবে। তাপমাত্রা বেশী হলে চাটাই দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

চাষপদ্ধতি

সাধারণত মাদায় সরাসরি বীজ বপনের পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করে মাদায় রোপণ করাই উত্তম। এতে বীজের পরিমাণ কম লাগে এবং জমিতে ফাঁকা জায়গা থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণত প্রতি মাদায় ৩-৪ টি বীজ বপন করা হয়। বপনের ১০ দিন আগে মাদা তৈরি করে মাদার মাটিতে সার মেশাতে হবে। দুই মিটার দূরে দূরে সারি করে প্রতি সারিতে দুই মিটার অন্তর মাদা তৈরি করতে হবে। মাদার সাইজ হবে ২০×২০×২০ ইঞ্চি। বীজ গজানোর পর প্রতি মাদায় দুটি করে চারা রেখে বাকি চারাগুলো তুলে ফেলতে হবে। বীজ বপনের চেয়ে তরমুজ চাষে চারা রোপণ করাই উত্তম। চারা তৈরি করার জন্য ৪×৫ ইঞ্চি মাপের পলিথিনের ব্যাগে ৫০:৫০ অনুপাতে বালু ও পচা গোবর সার ভর্তি করে প্রতি ব্যাগে একটি করে বীজ বপন করতে হবে। ৩০-৩৫ দিন বয়সের ৫-৬ পাতা বিশিষ্ট একটি চারা মাদায় রোপণ করতে হবে।

শস্য সংগ্রহ

ফসল তোলা

জাত ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে তরমুজ ফল পাকতে ৮০-১০০ দিন সময় লাগে। ফলের পাকা অবস্থা নির্ণয় করা কঠিন। তবে নিম্নোক্ত লক্ষণ অনুমান করে ফসল পাকা অনুমান করা যায়।

১। ফলের বোটার সঙ্গে যে আকাশী রঙ থাকে তা শুকিয়ে বাদামী রংঙের হয়।

২। খোসার উপরের সূক্ষ লোমগুলো মরে পরে গিয়ে তরমুজের খোসা চকচকে হয়।

৩। তরমুজের যে অংশটি মাটির উপর লেগে থাকে। তা সবুজ থেকে উজ্জ্বল হলুদ রঙের হয়ে থাকে।

৪। শাঁস লাল টকটকে হয়।

৫। আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিলে যদি ড্যাব ড্যাব শব্দ হয় তবে বুঝতে হবে যে ফল পরিপক্ক হয়েছে। অপরিপক্ক ফলের শব্দ হবে অনেকটা ধাতবীয়।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে পাহাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাজারজাতকরণ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা: ঠেলাগাড়ি, রিক্সা, ভ্যান, নৌকা।
আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা: ট্রাক।
প্রথাগত বাজারজাতকরণ: ফসল তোলার পর সরাসরি বাজারজাত করা হয়।

মরিচ

মরিচ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। আমাদের দেশে মূলত মরিচ মসলা ফসল হিসেবে পরিচিত। কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। পুষ্টিমানে কাঁচা মরিচ ভিটামিন এ ও সি সমৃদ্ধ। দৈনন্দিন রান্নায় রং, রুচি ও স্বাদে ভিন্নতা আনার জন্য মরিচ একটি অপরিহার্য উপাদান। আমাদের দেশে সাধারণত মরিচ ছাড়া কোন তরকারি রান্না চিন্তা করা হয় না। এছাড়া বিভিন্ন খাবারের স্বাদ বাড়ানোর জন্য মরিচের সসের অনেক চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া এর ঔষধি গুণাগুণও রয়েছে। আমাদের দেশে মরিচের চাহিদা ২.৯৫ লাখ মেট্রিক টন কিন্তু উৎপাদন হয় ২.৭৩ লাখ মেট্রিক টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া

পানি নিষ্কাশনে সুবিধাযুক্ত বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটিতে মরিচ চাষ করা হয়। তবে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উর্বর দোআঁশ মাটি চাষাবাদের জন্য উত্তম। সব মাটিতে মরিচের চাষ করা গেলেও ক্ষারীয় মাটিতে ফলন ভাল হয় না। মাটির পিএইচ ৬.০-৭.০ হলে মরিচের উৎপাদন ভালো হয়। বন্যা বিধৌত পলি এলাকায় মাঝারী ও উঁচু জমি যেখানে বর্ষার পর ভাদ্র (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে 'জো' আসে সেখানে মরিচ ভালো হয়। মরিচ উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভাল জন্মে। সাধারণত ২০- ২৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রা মরিচ চাষের জন্য উপযোগী। সর্বনিম্ন ১০ ডিগ্রী সে. এবং সর্বোচ্চ ৩৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় মরিচের গাছের বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায়। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে মরিচ গাছের পাতা ঝরে যায় এবং গাছ পচে যায়। পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল-দোআঁশ মাটিতে মরিচ চাষ করা যায়। তবে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ বা পলি দোআঁশ মাটি চাষাবাদের জন্য উত্তম। মাটি অতিরিক্ত ভিজা থাকলে ফুল ও ফল ঝরে পরে। মাটির পিএইচ ৬.৫-৭.০ হলে মরিচের ফলন ভালো হয়।

বপন/রোপণ সময়

বারি মরিচ-৩ এর জন্য সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজ তলায় বীজ বপন করতে হবে। মূল জমিতে সেপ্টেম্বর মাসে বীজ বপন করতে হবে এবং অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত মূল জমিতে চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

বীজ হার ও রোপন পদ্ধতি

বারি মরিচ-৩ এর বীজ ১.০-১.৫ কেজি/হে. সারিতে বপন ও ২.০-৩.০ কেজি/হে. বীজ ছিটিয়ে রোপণের জন্য দরকার। প্রতি হেক্টর জমিতে ৪০,০০০ চারা প্রয়োজন।

মরিচের বীজ শোধন

বীজ তলায় বীজ বপনের আগে মরিচের বীজকে শোধন করে নিতে হবে এতে করে চারা অবস্থায় রোগ-বালাই কম হবে। অটোস্টিন বা প্রোভেক্স জাতীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করা যায়। প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম অটোস্টিন ও ২.৫ গ্রাম প্রভেক্স-২০০ দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে বীজ বপনের পূর্বে মরিচ বীজ উপরে উল্লেখিত ছত্রাক নাশক দ্বারা ৩০ (ত্রিশ) মিনিট ভিজিয়ে রেখে ছায়াযুক্ত স্থানে ১০-১৫ মিনিট শুকাতে হবে বীজশোধনের কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও শোধিত বীজ ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বীজ শোধনের ফলে বীজ বাহিত রোগ সংক্রমণ থেকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

বীজ তলা তৈরি

বারি মরিচ ৩-এর চারা উৎপাদন করে মূল জমিতে রোপণ করার ক্ষেত্রে উত্তম চারা উৎপাদনে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি যেখানে পানি দাড়ায় না, যথেষ্ট আলো বাতাস পায়, পানি সেচের উৎস রয়েছে এবং আশে পাশে সোলানেসী পরিবারের কোন উদ্ভিদ নাই এরূপ জমি বীজতলা তৈরির জন্য উত্তম। প্রতিটি বীজ তলার আকৃতি ৩ মি.×১ মি. হওয়া বাঞ্চনীয়। এ ধরনের প্রতিটি বীজ তলায় ১৫ গ্রাম হারে বীজ সারিতে বপন করতে হবে। ভালো চারার জন্য প্রথমে বীজতলার মাটিতে প্রয়োজনীয় কম্পোস্ট সার এবং ছাই মিশিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। শোধিত বীজ তৈরিকৃত বীজতলায় ৪-৫ সেমি দূরে দূরে সারি করে ১ সেমি গভীরে সরু দাগ টেনে ঘন করে বপন করতে হবে। চারার পরিচর্যা: বীজ বপনের পর বীজতলায় বীজ যাতে পোকামাকড় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম সেভিন মিশিয়ে মাটিতে দিতে হয়। বীজ বপনের পর অতিবৃষ্টি বা প্রখর রোদ থেকে রক্ষা পেতে বাঁশের চাটাই বা পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিতে হবে। বাঁশের চাটাই বা পলিথিন সকাল, বিকাল বা রাতে সরিয়ে নিতে হবে। চারা গজানোর সাথে সাথে ইনসেক্ট গ্রুপ নেট দিয়ে চারা ঢেকে দিতে হবে। এই নেট রোদ, বৃষ্টি এবং ভাইরাস বহনকারী বিভিন্ন পোকামাকড় থেকে চারাকে রক্ষা করবে। বীজ বোনার পর চারা বের না হওয়া পর্যন্ত নেটের উপর ঝরনা দিয়ে সেচ দেয়া আবশ্যক। ৫-৭ দিনের

মধ্যে বীজ গজায়। চারা ৩-৪ সেমি হলে নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা পাতলা করা হয়। বীজতলায় আগাছা গজালে ১-২ বার নিড়ানী দিয়ে আগাছা বেছে মাটি আলগা করে দিলে চারা ভাল হয়। চারা তোলার আগের দিন বীজতলায় সেচ দিলে মাটি নরম হয়। এতে শিকড়ের ক্ষতি না করে সহজেই চারা তোলা যায় এবং চারা সহজেই জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে জমিতে লাগানোর উপযোগী হয়। খাট, মোটা কাণ্ড ও ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট চারা লাগানোর জন্য ভালো। সারি থেকে সারি ৫০ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছ ৫০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের মুহুর্তে পানি সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে মাটিতে সহজে গাছ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

জমি তৈরি

শীতকালীন মরিচের জন্য প্রথমে জমিকে চারিদিক দিয়ে আইলের অতিরিক্ত অংশ কেটে নিতে হবে। তারপর ৪-৬টি গভীর চাষ ও মই দিতে হবে। জমিতে শেষ চাষের পর মই দিয়ে সমান করে আগাছা বেছে ফেলে দিতে হবে। মাটির ঢিলা ভেঙ্গে মাটি ঝুরঝুর ও সমতল করে নিতে হবে। জমি তৈরিতে শেষ চাষের আগে জৈব এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। এরপর বেড তৈরি করতে হবে। বেড চওড়ায় ১ মিটার হলে ভাল হয়। তবে দৈর্ঘ্য জমির আকার অনুসারে হলে ভাল হয়। বেডের উচ্চতা ১০-১৫ সেমি হতে হয়।

হরমোন প্রয়োগ

প্ল্যানোফিক্স নামক হরমোন প্রয়োগে দেখা গেছে মরিচের ফুল কম ঝরে এবং ফলন বাড়ে। এক মিলিলিটার প্ল্যানোফিক্স ৪.৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে সমস্ত গাছের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। ফুল আসলে প্রথমবার এবং ২০-২৫ দিন পর দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করতে হবে। এক হেক্টর জমিতে প্রায় ৫০০ লিটার মিশ্রণের প্রয়োজন হয়। নিড়ানী: জমিতে আগাছার পরিমাণের উপর নির্ভর করে নিড়ানী দিতে হবে। যদি আগাছা বেশি থাকে তাহলে নিড়ানী বেশি দিতে হবে। অর্থাৎ জমিতে কোনক্রমেই আগাছা রাখা যাবে না।

সেচ

মাটিতে অতিরিক্ত আর্দ্রতা মরিচ সহ্য করতে পারে না আবার বেশি সেচ প্রয়োগ করলে গাছ লম্বা হয় ও ফুল ঝড়ে যায়। জমির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে ৩/৪টি সেচ দিতে হবে। ফুল আসার সময় এবং ফল বড় হওয়ার সময় জমিতে পরিমানমতো আর্দ্রতা রাখতে হবে।

মাটি তোলা

ভাল ফসলের জন্য ৩-৪ বার দুই সারির মাঝের মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হয়। সার প্রয়োগের পর পরই মাটি তুলে দিতে হয়। এতে গাছের গোড়া শক্ত হয়

এবং পানি নিষ্কাশনের সুবিধা হয়। সেচের পর মাটিতে চটা বাঁধলে নিড়ানী দিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে তাতে শিকড় প্রয়োজনীয় বাতাস পায় এবং গাছের বৃদ্ধি তরান্বিত হয়।

খুঁটি প্রদান

অধিক উচ্চতা, ফলনের ভার, ঝর বা অতি বৃষ্টির কারণে গাছ হেলে পড়ে। ফলে মরিচের গুণাগুণ হ্রাস পায়। প্রায় হেলে পড়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য খুঁটি প্রদান করা হয়। গাছের পাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতে প্লাস্টিকের সুতলী দিয়ে গাছ বেধে দিতে হবে।

শস্য সংগ্রহ

মরিচ পাকা অবস্থায় তোলা হয়। বীজ বপনের ৬০-৬৫ অথবা চারা লাগানোর ৩৫-৪০ দিন পর গাছে ফুল ধরতে শুরু করে, ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে ফল ধরে এবং ৭৫ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে আরম্ভ করে। সাধারণত কৃষকের প্রথম বারের সংগৃহীত ফসল কাচা মরিচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরের মরিচ পাকা (লাল রং) হিসেবে সংগ্রহ করা হয়। লম্বা, উজ্জল লাল বর্ণ, চকচকে, পাতলা মসৃণ ত্বক এবং বেশি ঝাঁঝের পাকা মরিচ (যা পরবর্তীতে শুকানো হয়) মসলা হিসাবে অধিক জনপ্রিয়। মরিচের ফুল ফোঁটা, ফল ধরা, রং ধারণ ইত্যাদি তাপমাত্রা, মাটির উর্বরতা এবং ভালো জাতের উপর নির্ভর করে। উষ্ণ তাপমাত্রায় ফল তাড়াতাড়ি পাকে এবং ঠাণ্ডায় ফল পাকতে দেরি হয়। অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে এর স্বাভাবিক উৎপাদন কয়েক মাস পর্যন্ত চলতে পারে। পাকা মরিচ সাধারণত ৩-৫ পর্যায়ে তুলতে হয়। বোঁটাসহ মরিচ তুলতে হয়। কারণ বোঁটা ছাড়া মরিচ তাড়াতাড়ি সজিবতা হারায় ও সহজে রোগাক্রান্ত হয়। শুকনো মরিচের জন্য আধাপাকা মরিচ তুললে মরিচের রং ও গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়।

বাজারজাতকরণ

দূরবর্তী স্থানে কাঁচা মরিচ পরিবহনের ক্ষেত্রে ছিদ্রযুক্ত বাঁশের ঝুড়ি এবং চটের ব্যাগ ব্যবহার করলে মরিচ ভাল থাকে। মরিচ শুকানোর পরে ছায়াযুক্ত স্থানে ঠাণ্ডা করে সংরক্ষণ করতে হবে।

পেঁপে

পেঁপে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ফল। বাংলাদেশেও পেঁপে খুবই জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। পেঁপের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত এটা স্বল্পমেয়াদী, দ্বিতীয়ত ইহা কেবল ফল নয় সবজি হিসেবেও এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে, তৃতীয়ত পেঁপে অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং ঔষধী গুণসম্পন্ন। বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা ও যশোরে উৎকৃষ্ট মানের পেঁপে উৎপন্ন হয়। এদেশে বর্তমানে প্রায় ১.৬ হাজার হেক্টর জমিতে পেঁপের চাষ হয় এবং এর মোট উৎপাদন প্রায় ২১.৬ হাজার টন। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৭ টন। আমের পরই ভিটামিন 'এ' এর প্রধান উৎস হল পাকা পেঁপে। কাঁচা পেঁপেতে প্রচুর পেপেইন নামক হজমকারী উপাদান থাকে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

সুনিষ্কাশিত, উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। উপযুক্ত পরিচর্যার দ্বারা প্রায় সব ধরনের মাটিতেই পেঁপের চাষ করা যায়। তবে উচ্চ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ বেলে দোআঁশ মাটি উত্তম।

বীজের হার

দুই মিটার দূরে দূরে সারি করে প্রতি সারিতে ২ মিটার দূরত্বে চারা রোপণ করলে ১ হেক্টর জমিতে ২৫০০ গাছের জন্য ৭৫০০ চারার প্রয়োজন হয়। সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১৪০-১৬০ গ্রাম বীজ দিয়ে প্রয়োজনীয় চারা তৈরি করা যায়।

চারা তৈরি

বীজ থেকে বংশ বিস্তার করা হয়। পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করলে রোপণের পর চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৫×১০ সেমি আকারের ব্যাগে সমপরিমাণ বালি, মাটি ও পচা গোবরের মিশ্রণ ভর্তি করে ব্যাগের তলায় ২-৩টি ছিদ্র করতে হবে। তারপর এতে সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১টি এবং পুরাতন হলে ২-৩টি বীজ বপন কতে হবে। একটি ব্যাগে একের অধিক চারা রাখা উচিত নয়। ২০-২৫ দিন বয়সের চারায় ১-২% ইউরিয়া স্প্রে করলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

পেঁপে গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই পেঁপের জন্য নির্বাচিত জমি হতে হবে জলাবদ্ধতামুক্ত এবং সেচ সুবিধাযুক্ত। জমি বার বার চাষ ও মই দিয়ে উত্তম রূপে তৈরি করতে হবে। দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে বেড পদ্ধতি অবলম্বন করা উত্তম। পাশাপাশি দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি চওড়া এবং ২০-২৫ সেমি গভীর নালা থাকবে। নালাসহ প্রতিটি বেড ২ মিটার চওড়া এবং জমি অনুযায়ী লম্বা হবে।

গর্ত তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে বেডের মাঝ বরাবর ২ মিটার দূরত্বে ৬০×৬০×৪৫ সেমি আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্ত প্রতি ১৫ কেজি পঁচা গোবর, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম, ২০ গ্রাম বরিক এসিড এবং ২০ গ্রাম জিংক সালফেট সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মেশাতে হবে। সার মিশ্রিত মাটি দ্বারা গর্ত পূরণ করে সেচ দিতে হবে।

বীজ বপন ও চারা রোপণের সময়

আশ্বিন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) এবং পৌষ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) মাস পেঁপের বীজ বপনের উত্তম সময়। বপনের ৪০-৫০ দিন পর চারা রোপণের উপযোগী হয়।

চারা রোপণ

চারা লাগানোর পূর্বে গর্তের মাটি উলট পালট করে নিতে হয়। প্রতি গর্তে ৩০ সেমি দূরত্বে ত্রিভুজ আকারে ৩টি করে চারা রোপণ করতে হয়। বীজ তলায় উৎপাদিত চারার উন্মুক্ত পাতাসমূহ রোপণের পূর্বে ফেলে দিলে রোপণকৃত চারার মৃত্যু হার কমবে এবং চারা দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হবে। পলিব্যাগে উৎপাদিত চারার ক্ষেত্রে পলিব্যাগটি খুব সাবধানে অপসারণ করতে হবে যাতে মাটির বলটি ভেঙ্গে না যায়। পড়ন্ত বিকাল চারা রোপণের সর্বোত্তম সময়। রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে চারার গোড়া যেন বীজতলা বা পলিব্যাগে মাটির যতটা গভীরে ছিল তার চেয়ে গভীরে না যায়।

শস্য সংগ্রহ

পেঁপে সবজি হিসেবে ব্যবহার করলে ফলের কষ যখন হালকা হয়ে আসে এবং জলীয় ভাব ধারণ করবে তখন সংগ্রহ করতে হবে। ফলের গায়ে যখন হালকা হলুদ ভাব দেখা যাবে তখন ফল হিসেবে সংগ্রহ করতে হবে।

বাজারজাতকরণ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থাঃ ঠেলাগাড়ি, রিক্সা, ভ্যান, নৌকা।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থাঃ ট্রাক।

প্রথাগত বাজারজাত করণ

ফসল তোলার পর সরাসরি বাজারজাত করা হয়।

ভূট্টা

ভূট্টা একবীজপত্রী, শক্ত, এক কান্ডবিশিষ্ট Graminae গোত্রের এক ধরনের বীরুৎ উদ্ভিদ যা খাদ্যশস্য হিসেবে বহুল পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ভূট্টা কর্ন (Corn) নামে পরিচিত এবং ইউরোপসহ অন্যান্য অনেক দেশের প্রধান খাদ্যশস্য ভূট্টা। আমাদের দেশেও ভুট্টা বা কর্ন অতিপরিচিত একটি খাবার।

ভূট্টার ব্যবহার

ভুট্টা থেকে তৈরী করা যায় নানারকম রুটি, খিচুরি, ফিরনি সহ অনেক সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার। এছাড়াও মজাদার চাইনিজ খবার তৈরীতেও ভূট্টার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। টিফিন পিরিয়ডের বন্ধুদের সাথে আড্ডায়, ক্লান্তিকর দীর্ঘপথ চলা, ট্রাফিক জ্যাম বা প্রিয়জনের সাথে থিয়েটারে মুভি দেখায় সময়গুলোকে বিরক্তিহীন ও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে পপকর্নের জুড়ি নেই যা ভূট্টা থেকেই প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ভূট্টা শুধু সুস্বাদু তাই নয় এটি স্বাস্থ্যকরও বটে। এতে রয়েছে ভিটামিন এ, যা আমরা সবাই জানি দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক। এছাড়াও এতে উপস্থিত ভিটামিন বি ১২ ও আয়রন রক্তাল্পতা বা এনিমিয়া দূর করে এবং ভিটামিন ‘এ’ ‘সি’ ও লাইকোপিন ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এছাড়াও নিয়মিত ভূট্টা খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ হয়, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে থাকে, ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় এবং হৃদপিন্ড ও কিডনির সুরক্ষা প্রদান করে। এছাড়াও গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মাছের খাবার হিসেবে ভূট্টা গুড়া ব্যবহৃত হয়। শুধু তাই নয়, জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। এ কারণেই ভূট্টার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে এবং সেই সাথে বাড়ছে এটি উৎপাদনে কৃষকের আগ্রহ।

জাত নির্বাচন

বাংলাদেশে ধান ও গমের পরেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকদের পছন্দের শস্য ভূট্টা। কিন্তু সঠিকজাত নির্বাচনের অভাব তারা অনেকেই প্রত্যাশিত ফলনটি পাচ্ছেন না ফলে অর্থনৈতিকভাবে তেমন লাভবান হতে পারছেন না। ভূট্টার অনেক জাত রয়েছে। এর মধ্যে বর্ণালী, শুভ্রা, উত্তরণ অন্যতম। এগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কর্তৃক উদ্ভাবিত কিছু হাইব্রিড জাত রয়েছে। যেমন:

১। বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫: ফলন রবি মৌসুমে ৯-১০ টন এবং খরিপ মৌসুমে ৭-৭.৫ টন।

২। বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭ : ফলন রবি মৌসুমে ১০.৫-১১.৫ টন।

৩। বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯ : ফলন রবি মৌসুমে ১১.৫-১২.৫ টন।

৪। বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১০ : ফলন রবি মৌসুমে ১০-১১.৫ টন।

৫। বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১১ : ফলন রবি মৌসুমে ১০.৫-১১.৫ টন।

৬। বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২ : খরা অবস্থায় ৮.১-৮.৫ টন স্বাভাবিক সেচ প্রয়োগে ১০-১১.১ টন।

৭। বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৩: খরা অবস্থায় ৮.২-৮.৯, স্বাভাবিক সেচে ১০.১-১১.২ টন।

৮। বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪ : ফলন রবি মৌসুমে ১০.৮৫ টন এবং খরিপ মৌসুমে ১০.৫২ টন।

৯। বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৫: ফলন রবি মৌসুমে ১২.৭৫ টন এবং খরিপ মৌসুমে ১২.০৭ টন।

১০। বারি মিষ্টি ভুট্টা-১ : ফলন রবি মৌসুমে ১০-১০.৫ টন এবং এই জাত থেকে প্রায় ২৫ টন হেক্টর সবুজ গো খাদ্য পাওয়া যায়।

বীজ নির্বাচন

জাত নির্বাচনের পাশাপাশি নিরোগ, সঠিক অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন সুস্থ্য বীজ নির্বাচন করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর মধ্যে খোলা বীজ না কিনে ভালো প্রতিষ্ঠানের উন্নত মানসম্পন্ন বীজ কেনা উচিত। এর মধ্যে লাল তীর কোম্পানির প্যাসিফিক ৫৫৫ হাইব্রিড (১৩-১৫ টন/হেক্টর), ভূট্টা-৩৩৯, জিটি ৮২২, ইস্পাহানি কোম্পানির দূরন্ত ২০২, সিনজেনটা কোম্পানির এন কে-৪০, আস্থা, শানশাইন অন্যতম।

বীজ বপনের সময়

ভুট্টা বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো রবি মৌসুমে মধ্য আশ্বিন-মধ্য অগ্রহায়ন (অক্টোবর-নভেম্বর) ও খরিপ মৌসুমে ফাল্গুন-মধ্য চৈত্র (মধ্য ফেব্রুয়ারি-মার্চ) পর্যন্ত। বেলে দোঁআশ এবং দোঁ-আশ মাটি ভুট্টা চাষের জন্য উপযুক্ত। তবে খেয়াল রাখতে হবে কোনোভাবেই যেন গাছের গোড়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হয়। এছাড়াও পলিযুক্ত মাটিতে যেমন চর অঞ্চলে বিনা চাষে ভুট্টা আবাদ করা যায়।

জমিতে বীজ বপন

ভুট্টার বীজ রবি ও খরিপ উভয় মৌসুমেই সারিতে বুনতে হয়। এক্ষত্রে শুভ্রা, বর্নালী ও মোহর জাতের জন্য হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি এবং খই ভুট্টার জন্য হেক্টর প্রতি ১৫-২০ কেজি হারে ভুট্টা বীজ প্রয়োজন হবে।

সারি থেকে সারির দূরত্ব ঃ রবি মৌসুম ৭০ সেঃ মিঃ
খরিপ মৌসুম ৬০ সেঃ মিঃ

বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ঃ ২৫ সেঃ মিঃ
বপনের গভীরতা ঃ ১ থেকে ১.৫ ইঞ্চি
প্রতিটি গর্তে বীজের সংখ্যা ঃ ১ টি

সার ব্যবস্থাপনা

পরিমানঃ কেজি/হেক্টর

সারের	কম্পোজিট (রবি)	কম্পোজিট (খরিপ)	হাইব্রিড (রবি)
ইউরিয়া	১৭২-৩১২	২১৬-২৬৪	৫০০-৫৫০
টিএসপি	১৬৮-২১৬	১৩২-২১৬	২৪০-২৬০
এমওপি	৯৬-১৪৪	৭২-২১৬	২৪০-২৬০
জিপসাম	১৪৪-১৬৮	৯৬-১৪৪	২৪০-২৬০
জিংক সালফেট	১০-১৫	৭-১২	১০-১৫
বোরিক এসিড	৫-৭	৫-৭	৫-৭
গোবর	৪-৬ টন	৪-৬ টন	৪-৬ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জমি তৈরীর শেষ পর্যায়ে অনুমোদিত ইউরিয়ার তিন ভাগের এক ভাগ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে জমি চাষ দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম কিস্তি হবে বীজ গজানোর ৪০-৫০ দিন পর। চারা গজানোর ৩০ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে এবং চারার বয়স একমাস না হওয়া পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

আগাছা দমন ঃ ভূট্টার ক্ষেতে সাধারনত শাকনটে, কাটানটে, বনবেগুন, মুথা, চাপড়া ঘাস, আংগুলি ঘাস, শ্যামা, বিষকাটালি সহ বিভিন্ন রকমের আগাছা জন্ম নেয়। ইউরিয়া সার প্রয়োগের পূর্বে নিড়ানী ও ছোট কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নিয়ে তারপর সার ও পানি সেচ দিতে হবে। এক্ষেত্রে অনুমোদিত আগাছানাশক পরিমিত পরিমানে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পোকা দমন

কাটুই পোকাঃ

- কীড়া অবস্থায় এই পোকা দিনের বেলা মাটির ফাটল বা গর্তে লুকিয়ে থাকে।
- রাতের বেলা বের হয়ে গাছের গোড়ার মাটি বরাবর কেটে দেয়।
- তীব্র আক্রমণে ক্ষেত প্রায় চারাশূন্য হয়ে যেতে পারে।

দমন ঃ

- সকাল বেলা কেটে দেয়া চারার আশে পাশের মাটি খুড়ে কীড়া সংগ্রহ করে মেরে ফেলা।
- বীজ বপনের আগে ৩ এমএল ক্যারাটে প্রয়োজনীয় পানির সাথে মিশিয়ে মাটিতে স্পে করা এবং ২৫-৩০ গাছের বয়স হলে পুনরায় স্পে করা।

উইপোকাঃ

- সাধারণত গাছে মোচা আসার পরে আক্রমণ করে।
- উইপোকা গাছের গোড়ার দিকের মাটি উপরে তুলে ফেলে ফলে গাছ শুকিয়ে মারা যায়।

দমন ঃ

- উইপোকা দেখতে পেলে মেরে ফেলতে হবে।
- উইপোকা দমনের জন্য একতারা ২৫ ডব্লিউজি এই কীটনাশক কার্যকরী ও অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

ভুট্টার বীজ পচা রোগঃ নানা প্রকার ছত্রাক ভুট্টার বীজ পঁচিয়ে থাকে ফলে ভূট্টার চারা গাছের সংখ্যা কমে যায়। জমিতে রসের পরিমান বেশী হলে এবং মাটির তাপমাত্রা কম থাকলে বপনকৃত বীজ হতে চারা তৈরী হতে অনেক সময় লাগে। ফলে এ সময় ছত্রাকের আক্রমন হতে পারে।

প্রতিকার

- ভুট্টার বীজ পঁচা রোগ প্রতিরোধী জাত বর্ণালী ও মোহর ব্যবহার করতে হবে।
- থিরাম বা ভিটাভেক্স (০.২৫%) প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩০ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করে রোপন করতে হবে।

ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগঃ আমাদের দেশে সাধারণত হেলিমেনথোস পরিয়াম টারসিকার্ম নামক ছত্রাকের কারণে বেশি পাতা ঝলসানো রোগ দেখা যায়। এক্ষেত্রে আক্রান্ত গাছের নিচের দিকের পাতায় লম্বাটে ধূসর বর্ণের দাগ দেখা যায়। রোগের প্রকোপ বেশি হতে পাতা আগাম শুকিয়ে যায় এবং গাছ মরে যায়।

প্রতিকার

- আক্রান্ত ফসলে টিল্ট ২৫০ ইসি (০.০৪%) ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধী জাত 'মোহর' চাষ করা যেতে পারে।

ভুট্টার কান্ড পচা রোগঃ ছত্রাকের আক্রমনে মূলত পচা রোগ হয়ে থাকে। প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে গাছের কান্ড পচে ভেঙ্গে পড়ে। আমাদের দেশে সাধারণত রোগ বেশি হয়ে থাকে।

প্রতিকার

- পরিমিত পরিমানে হাইড্রোজেন প্রয়োগ করতে হবে।
- ছত্রাকনাশক ভিটাভেক্স-২০০ দিয়ে বীজ পরিশোধন করে রোপন করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

ভুট্টার আশানুরুপ ফলন পেতে সেচ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। ৩-৪ টি ধাপে সেচ দিতে হবে।

প্রথম সেচঃ বীজ বপনের ১৫-১০ দিনের মধ্যে।
দ্বিতীয় সেচঃ বীজ বপনের ৩০-৩৫দিনের মধ্যে।
তৃতীয় সেচঃ বীজ বপনের ৬০-৭০ দিনের মধ্যে।
চতুর্থ সেচঃ বীজ বপনের ৮৫-৯০ দিনের মধ্যে।
আবার অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ করা যাবে না, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

- দানার জন্য পাকা মোচা গাছ থেকে তুলতে হবে।
- মোচা খড়ের রং ধারন করলে পাতা কিছুটা হলুদ এবং মোচা থেকে ছড়ানো, বীজের গোড়ায় কালো দাগ দেখা দিলে বোঝা যাবে মোচা পেঁকেছে।
- ফসলের রস কমাতে কয়েকদিন ফসল জমিতে রোদে রেখে শুকিয়ে নিতে হবে।
- এক্ষেত্রে মোচা সংগ্রহের পর খোঁসা ছাড়িয়ে ৩-৪ দিন রোদে শুকানো যেতে পারে।
- মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে দানা আলাদা করে আবার রোদে শুকাতে হবে।
- সর্বশেষে বাজারজাত করতে হবে।

ধান

পথের কেনারে দাঁড়ায়ে রয়েছে আমার ধানের ক্ষেত,
'আমার বুকের আশা নিরাশার বেদনার সঙ্গেত।
পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন

"ভাতে মাছে বাঙালি' বলে আমাদের যে পরিচয়, তার সাথে যে ফসল জড়িয়ে আছে সেটি হচ্ছে ধান। ধান বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য ধান থেকে যে চাল হয়, চাল থেকে যে ভাত হয় সে ভাতই আমাদের প্রধান খাদ্য।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক ভাত খেয়ে জীবনধারণ করে। ধান বীজ সুপ্রাচীন কাল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রধান খাদ্য। জাপান ও চীনের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় ১০,০০০ বছর আগে ধান চাষ শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়। ব্যাপক অভিযোজন ক্ষমতার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৬০০ মিটার উচ্চতায়ও (জুমলা,নেপাল) ধান জন্মায়।

ধান চাষের মৌসুম এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু

মৌসুম

চাষের সময়ের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের ধানকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এ প্রধান তিনটি ভাগ হলো-

(ক) আউশ ধান
(খ) আমন ধান
(গ) বোরো ধান

জলবায়ু

ধান মূলত ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের ফসল।

বৃষ্টিপাত

ধান চাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। সাধারণভাবে ১৫০ থেকে ২৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন।

তাপমাত্রা

সাধারণভাবে ১৬-২৭ ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন। গড় তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

বিভিন্ন মৌসুম

আউশ ধানঃ দ্রুত (আশু) ফসল উৎপন্ন হওয়ার বিচারে এই ধানের নাম করা হয়েছে আউশ। এ ধান সাধারণত বর্ষাকালের আষাঢ় মাসে জন্মে এই কারণে এই ধানের অপর নাম আষাঢ়ী ধান।
বাংলাদেশের আউশধানের যে জাতগুলো চাষ করা হয় তা হলো আটলাই, কটকতারা, কুমারী, চারণক, দুলার, ধলাষাইট, ধারাইল, পশুর, পানবেড়া, পাষপাই, পুখী, হাসি কলমি, কালামানিক, মূলকে আউশ ইত্যাদি।

আমন ধানঃ সংস্কৃত হৈমন শব্দের অপভ্রংশ, ধান বিশেষ। এর অপর নাম আগুনী ও হৈমন্তিক। আমন চাষে সবচেয়ে বেশি জমি ব্যবহৃত হয়। আমন ধান আবার ৩ প্রকার।

(ক) রোপা আমন : চারা প্রস্তুত করে সেই চারা রোপণ করে এই ধান উৎপন্ন হয় বলে এর নাম রোপা আমন। রোপা-আমন জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে বীজতলায় বীজ বপন করা হয়, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে মূল জমিতে রোপণ করা হয় এবং অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ধান কাটা হয়।

(খ) বোনা আমন: এই আমন ছিটিয়ে বোনা হয়। বোনা আমন চৈত্র-বৈশাখ মাসে মাঠে বীপ বপণ করা হয় এবং অগ্রহায়ণ মাসে পাকা ধান কাটা হয়। একে আছড়া আমন ও বলা হয়।

(গ) বাওয়া আমন: বিল অঞ্চলে এই আমন উৎপন্ন করা হয়। একে এই কারণে গভীর পানির বিলে আমনও বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রজাতির আমন ধানের চাষ হয়ে থাকে। যেমন: ইন্দ্রশাইল, চিংড়িখুশি, চিটবাজ, ঢেপি, লাটশাইল, বাঁশফুল, বাইশাবিশ, রাজাশাইল, নাগরা ইত্যাদি।

তাছাড়া রবি মৌসুম এবং খরিপ মৌসুম হিসেবেও ধান চাষকে ভাগ করা হয়ে থাকে। রবি মৌসুমের সময়সীমা (অক্টোবর-মার্চ) এবং খরিপ মৌসুমের সময়সীমা (মার্চ-অক্টোবর)। রবি মৌসুমে আমন ধান চাষ হয় এবং খরিপ মৌসুমে আউশ ধান চাষ করা হয়।

বোরো ধানঃ বোরো ধান প্রধানত সেচ নির্ভর। কার্তিক মাস থেকে বীজতলায় বীজ বপণ করা শুরু করা হয়। ধান কাটা চলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত। বোরো ধান উচ্চ ফলনশীল এবং ধান উপৎপাদনের দিক দিয়ে প্রথম।
বসন্তকালে বোরো ধান জন্মে বলে একে 'বাসন্তিক' ধানও বলা হয়ে থাকে।

কোন মৌসুমে ধান চাষ বেশি হয়?

ধান চাষের ভিন্ন তিন মৌসুম থাকলেও বোরো মৌসুমে সবচেয়ে বেশি ধান চাষ হয় এবং ফলন অধিক হয়। বিভিন্ন জেলায় বেশ কয়েক হেক্টর নিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির বোরো ধান চাষ করা হয়েছে। এর মধ্যে বি আর ১৪, উফসি ২৮,২৯,৩৩,৭৪,৮১ এই জাতের ৩৫ হাজার ৪৩০ হেক্টর, হাইব্রীড এসি আই ১,২,৩ জাতের ২৪ হাজার ৫৬০ হেক্টর, সিনজেনটা (হিরা) ১,২,৩,৪ জাতের ২১ হাজার ১০ হেক্টর জমিতে ধান চাষ করা হয়েছে নীলফামারিতে।

ধানের বিভিন্ন প্রজাতি

বাংলাদেশে প্রায় ৫,০০০ প্রজাতির ধান জন্মায়। অঞ্চল, অবস্থান এবং জলবায়ুগত অভিযোজন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জাত আবিষ্কার করা হয়েছে। কিছু ধানের প্রজাতির নাম নিচে উল্লেখ করা হলো-
উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতসমূহ: ব্রি ধান (৩৫,৩৬,৩৯,৫৯,৬৮,৬৯,৯৬,৯৮) ইত্যাদি। তাছাড়া বি-আর (১,২,৩,৪,৬,৭,৮,৯,১০,১১,১২,১৩,১৪) ইত্যাদি ও উচ্চফলনশীল ধানের জাত।

* হাইব্রিড ধানের জাত সমূহ : ব্রি হাইব্রিড ধান (১-৭)
* লবণাক্ততা সহিষ্ণু দানের জাতসমূহ : ব্রি-ধান ৬৭, ৭৩, ৯৭ ইত্যাদি।
* বন্যা সহিষ্ণু জাত সমূহ : ব্রি-ধান ৭৮
* অবলণাক্ত জোয়ার-ভাটা সহিষ্ণু : ব্রি ধান (৭৬, ৭৭)
* খরা সহিষ্ণু ধানের জাত : ব্রি ধান ৭১
* জিংক সমৃদ্ধ ধানের জাত : ব্রিধান (৬২,৭২,৭৪,৮৪)
* সুগন্ধিযুক্ত ধানের জাত : ব্রি-ধান (৯০,৭০,৮০,৫০,৩৭,৩৮,৩৪), বি আর (৫), দুলাভোগ ইত্যাদি।

বিভিন্ন রঙের ধান

বিভিন্ন প্রজাতরি পাশাপাশি বিভিন্ন রংয়ের ধান চাষ করা হয়। যেমন- কালো রংঙের ধান, বাদামী রংঙের ধান, লাল রংঙের ধান, সাদা রংঙের ধান ইত্যাদি।

- কালো ধান চীন, ইন্ডিয়া থাইল্যান্ডে বেশি চাষ হলেও সম্প্রতি বাংলাদেশে চাষ করা হয়। ফিলিপাইন ব্ল্যাক রাইস, থাই জেসমিন ইত্যাদি জাত ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ডে চাষ হয়। তবে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চাষ হয় 'কলাবতী' এবং কৃষ্ণাভ্রিশি জাত।
- সাদা ধান বলতে যে ধানের চাল তুলনামূলক সরু এবং লম্বা হয়। এ ধানের অপর নাম Polished Rice অথবা milled rice যেমন বাসমতী ধান, ব্রি-ধান ইত্যাদি। এ ধানের খোসা ছাড়িয়ে চাল করা হয়।
- লাল রংঙের ধান সম্প্রতি ঢাকার গাজীপুরে চাষ করা হয় ৫০ বিঘা জমিতে। এর পাতার রং কিছুটা বেগুনী। ধানের নাম 'লাল বিরই'। চালের আবরণী লাল রংঙের।
- বাদামী রংঙের ধান প্রায় সব অঞ্চলেই চাষ করা হয়। চালের আবরণ বাদামী রংঙের। পাতা সোনালী রংঙের। যেমন: চিনিগুড়া, চান্দিনা, মালা ইত্যাদি।

ধান বীজতলা তৈরি

১ মিটার চওড়া প্রয়োজনমত দৈঘ্য বিশিষ্ট জমি নিয়ে বীজতলা তৈরির সময় ৫-১০ কেজি পঁচা গোবর সার ব্যবহার করে আড়াআড়িভাবে মই চাষ দিয়ে বীজতলা ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে ৫০-৬০ গ্রাম অংকুরিত বীজ (যা পূর্বে সাধারণভাবে ধানের বীজ জাগ দিয়ে অংকুরিত করা হয়), এই হারে প্রতি শতকে ভিত্তি বীজের প্রয়োজন হবে ৩ কেজি। বীজ মাটিতে ছিটিয়ে কালো পলিথিন ব্যতীত অন্য যেকোনো পলিথিন দিয়ে ঢেতে দিতে হবে। বীজতলা ২০-২৫ দিন ঢেকে রাখলে চারাগুলো রোপণ উপযোগী হবে।

বীজতলা মূলত তিনভাবে করা যায়।

১। ভিজা

২। শুকনা

৩। ভাসমান

- ভিজা বীজতলায় দোঁআশ ও এটেল মাটিতে খরকুটা/আবর্জনামুক্ত জমি নির্বাচন করে ২-৩ ইঞ্চি পানি ও ২-৩ চাষ দিয়ে ৭-৮ দিন আটকিয়ে আবর্জনা পঁচিয়ে কাদাযুক্ত জমিতে বীপ বপণ করা হয়।
- ভাসমানের জন্য বন্যা বা পুকুরের পানির উপর মাচা তৈরি করা হয় বাঁশের। তার উপরে ১-২ ইঞ্চি পুরু কাদার স্তর দিয়ে কাঁদায় বীজতলা তৈরি করা হয়।

উপরোক্ত তিন পদ্ধতির মধ্যে শুকনা বীজতলা তৈরি পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয়।

ধান চাষ পদ্ধতি

আধুনিক পদ্ধতি: জমিতে হেক্টরপ্রতি ৩-৫ টন জৈব সার ভালোভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ৫-১০ সে.মি পানি দিয়ে দুটি চাষ আড়াআড়ি ভাবে দিয়ে ৭-৮ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এবার ১০-১৫ সে.মি গভীর করে আড়াআড়িভাবে দুটি চাষ ও দুটি মই দিয়ে ৩-৪ দিন অপেক্ষা করার পর শেষ চাষ দিতে হবে। তারপর বীজতলা হতে বীজের চারা রোপণ করতে হবে। চারার বয়স আউশ এবং বোরোতে ৩৫-৪৫ দিন হওয়া উচিত।

রোপনের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে এবং ২-৩ সে.মি. গভীরে চারা রোপণ করতে হবে। এতে কুশির সংখ্যা বেশি হয়। চারা রোপনে

- সারি থেকে সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি
- চারা থেকে চারার দূরত্ব ৬ ইঞ্চি
- মাটির গভীরতা ১ ইঞ্চি এবং
- প্রতি গোছায় ২ টি ৩-৫ পাতার সুস্থ্যসবল চারা রোপন করতে হবে।
- বীজতলা থেকে চারা উঠানোর ২-৩ ঘন্টার মধ্যেই জমিতে লাগাতে হবে।

ধানের কার্যকরী কুশি বাড়াতে রোপণের ১০-১৫ দিন বয়সে থিয়োভিট একর প্রতি ১ কেজি হারে প্রয়োগ করত হবে। এর ফলে-

- সবুজ কনা বাড়বে
- শিকড় বৃদ্ধি হবে
- কার্যকরী কুশির সংখ্যা বাড়বে
- ফলন বাড়বে।

বাজারজাতকরণ

নিরাপদ কৃষি পণ্য (ধান) প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সরবরাহের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাধীন বিটিএ মুড়ির মিল, ভূল্লি বাজারে উন্নয়নকৃত নির্ধারিত নিরাপদ কৃষিপণ্য কালেকশান পয়েন্টে ন্যায্য দামে কন্ট্রাক্ট ফার্মার গন বিক্রয় করতে পারবে। অপরদিকে সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার লোকজন এসে নিরাপদ কৃষি পণ্য (ধান) প্রক্রিয়াজাতকরনের উদ্যেশ্যে সঠিক দামে ক্রয় করে নিয়ে যাবে।

সুগন্ধী ধান

সুগন্ধী ধানের জাত বেশির ভাগই আলোক সংবেদনশীল। দিনের দৈর্ঘ্য কমে গেলে হেমন্তকালে ফুল ও দানা গঠন হয়। প্রধানত আমন মৌসুমে সুগন্ধি ধানের চাষ করা হয়। যেমন- চিনিগুড়া, কালোড়ি, কাটারীভোগ, তুলসীমালা, বেগুনবিচি, বাঁশফুল, বাদশাভোগ।

সুগন্ধিধানের চাষপদ্ধতি

ভাল গন্ধ ও ফলন পেতে হলে আমন ধানের ক্ষেত্রে চারা রোপনের আদর্শ সময় ১-১৫ জুলাই। আগে রোপন করলে সুগন্ধ কমে যায়, পরে রোপণ করলে ফলন কমে যায়।

বোরো ধান চাষের ক্ষেত্রে চারা রোপনের সময়সীমা ১৫-৩০ জানুয়ারি।

* বীজতলা তৈরি
* বীজ শোধন
* দু'বার বোনা, সার দেওয়া, আগাছা দমন।
* চারটি পদ্ধতিতে মূলত সুগন্ধি ধান চাষ করা হয়।

উত্তরাঞ্চলে সুগন্ধি ধানের জাতগুলো: চিনিগুঁড়া, কালোজিরা, কাটারী, চল্লিশ জিরা, দুলাভোগ, উকনী, তুলসীমালা, চিনিকাটারী, চিনি আতপ, বাদশাভোগ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ব্রি ধান ৭০ ও ব্রি ধান ৮০ আমন মৌসুমে সর্বশেষ উচ্চ ফলনশীল ধান এবং আলো অসংবেদনশীল। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪.৫-৫০ মেট্রিক টন। যা কাটারিভোগ ধানের চেয়ে দ্বিগুণ।

অপরদিকে বোরো মৌসুমে সুগন্ধিযুক্ত আধুনিক ধানের জাত হচ্ছে ব্রি ধান ৫০ (বাংলামতি), হেক্টর প্রতি ফলন ৬ মেন্ট্রিক টন।

মাটি ও আবহাওয়া

সব মাটিই সুগন্ধি ধানের জন্য উপযোগী, তবে দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি উত্তম। ফুল আসার সময় থেকে পরিপক্কতা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মৃদু বাতাস, শীতল রাত্রি (২০-২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা) এবং রৌদ্রজ্বল আলোক দিন (২৫-৩২° সেলসিয়াস তাপমাত্রা) প্রয়োজন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

রোপা আমন মৌসুমে ৫-২৫ জুলাই (২১ আষাঢ়-১০ শ্রাবণ) পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। ২৫-৩০ দিনের চারা প্রতি গুছিতে ২-৩ টি করে ২০. সে.মি/১৫ সে.মি দূরত্বে রোপণ করা হয়।

সার ব্যবস্থাপনা

আমন মৌসুমে ৩৩ শতকে ইউরিয়া ১৮-২০ কেজি, টিএসপি ১০-১২ কেজি এমওপি ১৩ কেজি, জিপসাম ৯ কেজি এবং দস্তা ১৩ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

- ৩০-৪০ দিন পর জমি আগাছামুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ব্লাস্ট রোগ সংক্রমণ যাতে না হয় সেজন্য আগাম ব্যবস্থা নিতে হবে।

সংরক্ষণ এবং ব্যবহার

অগ্রহায়ণের (১-১৫) মধ্যে ধান কেটে ১২% এর কম আদ্রর্তায় রেখে সংরক্ষণ করা হয়। কাটারীভোগ ধান সবচেয়ে বেশি দিনাজপুরে উৎপাদন করা হয়। এ ধানের চালের পোলাও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। কাটারিভোগ ধানের চিড়া হালকা ধবধবে সাদা এবং সুগন্ধিযুক্ত, মিষ্টিযুক্ত। সুগন্ধি চালের পোলাও ছাড়াও পিঠা-পুলি, বিরিয়ানি, কাচ্চি, জর্দা, পায়েস, ফিরনি, ভুনা খিচুড়িসহ বেশ চমৎকার ও সুস্বাদু খাবার তৈরি করা হয় যা জিভে জল নিয়ে আসে। বাঙালির বারো মাসে তেরো পাবর্ণ। স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে আমাদের অবশ্যই যত্নসহকারে সুগন্ধি ধানের আবাদ করতে হবে। সুগন্ধি চালে ইনস্ট্যান্ট ফাস্টফুড তৈরি করা যেতে পারে তাই বিভিন্ন রেস্তোরা, চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, হোটেল কিংবা মোটেল পর্যটন কেন্দ্রে এ চালের ব্যবহার বাড়াতে হবে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে টকশো, টেলিভিশনে কৃষি বিষয়ক সংশ্লিষ্ট সব অনুষ্ঠানে দেশি সুগন্ধিচাল ও এর ব্যবহার প্রচার করতে হবে। তাছাড়া সুগন্ধি চালের গ্রেডিং, লেবেলিং এবং মান উন্নয়নের জন্য আলোচনা করতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে ১৩৬ টি দেশে সুগন্ধি চাল রপ্তানি করা হচ্ছে। কৃষক ও কৃষি বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টায় এ গন্ডি অচিরেই পেরিয়ে যাবে।

বিভিন্ন মৌসুমে ধানের রোগ ও তার প্রতিকার

একের পর এক ধানের নতুন জাত উদ্ভাবন করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সিটিটিউ (ব্রি) ভূমিকা রাখলেও বিভিন্ন রোগ-বালাইয়ের কারণে প্রত্যাশিত ফলন পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ধানের বিভিন্ন রোগ-বালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

ব্লাস্টরোগঃ ধানের ব্লাস্ট রোগ ছত্রাকজনিত মারাত্মক ক্ষতিকারক রোগ। বোরো ও আমন মৌসুমে সাধারণ এ রোগ হয়। অনুকূল আবহাওয়ায় এ রোগের আক্রমণে ফলন শতভাগ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। ব্লাস্ট বিভিন্ন জায়গায় দেখা দিতে পারে। যেমন- পাতা ব্লাস্ট, গিট ব্লাস্ট, নেক ব্লাস্ট।

পাতা ব্লাস্টঃ আক্রান্ত পাতা প্রথমে ছোট ছোট কালচে বাদামি দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে দাগগুলো বড় হয়ে মাঝখানটা ধূসর বা সাদা ও কিনারা বাদামি রোগ ধারণ করে। দাগগুলো একটু লম্বাটে এবং চোখের মত হয়।

শীষ ব্লাস্ট রোগঃ শিশির বা গুঁড়িগুড়ি বৃষ্টির সময় ধানের ডগার পাতা ও গোড়ায় সংযুক্ত স্থানে পানি জমে। ফলে উক্ত স্থানে জীবাণু স্পোর) আক্রমণ করে কালচে বাদামি দাগ তৈরি করে। পরে শুকিয়ে গেলে উক্ত স্থান সজীবতা হারায়, খাদ্য যায় না এবং চিটা দানা হয়। শীষ ভেঙ্গেও যায় মাঝে মাঝে।

প্রতিকারঃ থাইরাম ছত্রাক নাশক দ্বারা বীজ শোধন করে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। Azoxystrobin, Triazoles অথবা Strobilurins জাতীয় ছত্রাক নাশক বীজতলায় কুশি পর্যায়ে এবং থোড় আসার সময় স্প্রে করতে হবে। কম আক্রান্ত হলে, আক্রান্ত স্থান কর্তন করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

খোল পঁচা রোগঃ ধানের থোড় বের হওয়ার শেষ পর্যায়ে পাতার খোলে বিশেষ করে ডিম পাড়ে। পোকা যেমন অমন ছোট ছোট ফুসকুড়ি দেখা যায়। যার রং বাদামি এবং পরে কালচে হয়ে যায়। ধান অপুষ্ট ও চিটা হয়।

প্রতিকারঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষেত হতে পানি বের করে দিতে হবে তারপর আবার সেচ দিতে হবে। প্রতি ১০ লি. পানিতে প্রাউড/একনোজল ২০ মি.লি/ নাটিভো ৬ গ্রাম ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।

পাতা মোড়ানো পোকাঃ এ পোকা পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে পাতার ভিতরের সবুজ অংশ খায়, ফলে প্রথমে পাতা সাদা ও পরে পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়।

প্রতিকারঃ হাইড্রো/নাইট্রো/এসিমিক্স ২০-২৫ মি.লি এবং এসাটাফ/ মিমফেট/ ম্যাপডন ১৫ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে ৭ দিন অন্তর দুইবার স্প্রে করতে হবে।

টুংরো রোগ: টুংরো আউশ, বোরো ও আমন মৌসুমের একটি ভাইরাসজনিত ক্ষতিকর রোগ, যা ঘাসফড়িংয়ের মাধ্যমে ছড়ায়। আমন ও আউশ মৌসুমে এর ব্যাপকতা বেশি। জমিতে বিক্ষিপ্তভাবে দু একটি পাতা হলদে বা কমলা রং ধারণ করে প্রাথমিকভাবে। এই হলুদ হওয়া ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং পুরো জমি হলুদ হয়। গাছ খাটো হয়। ১০০% ফলন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

প্রতিকার: নিয়মিত ক্ষেত পর্যবেক্ষণ। বাহক পোকার আক্রমণ হতে হাতজাল বা আলোকফাঁদ ব্যবহার করে তা মেরে ফেলা। বীজতলায় পোকা পাওয়া গেলে মিপসিন/সাপসিন ১৫০ গ্রাম ৬৭ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি বিঘায় স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত গাছের সংখ্যা কম হলে সাথে সাথে তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

উৎপাদন ও প্রযুক্তি

বিজ্ঞানময় কৃষি, সমৃদ্ধময় আগামী”

কৃষিবিদ দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থান ধান চাষের দিক দিয়ে তৃতীয়।

চলতি অথবছর অর্থাৎ ২০২২/২০২৩ অর্থ বছরে ১১.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ধান চাষ করা হয় এবং মোট উৎপাদন ৩৫.৬৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। অতিরিক্ত বন্যার কারণে ফসলের ক্ষতি হওয়ায় USDA এর সমীক্ষাতে উত্তরবঙ্গের উৎপাদন কিছুটা কমেছে বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশের সব জেলায় ধান চাষ হলেও ধান উৎপাদনে বাংলাদেশে শীর্ষ জেলা ময়মনসিংহ।

গবেষণা হতে জানা যায়, ব্রির-বিজ্ঞানীরা উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় এ পর্যন্ত ৯০৮ টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে এসব জাত উদ্ভাবন করা হয়। তাছাড়া জমি চাষ এর জন্য Ploughing implement, সেচের জন্য Pump, আগাছা নিধনের জন্য ACI এর Agrotech Honda স্প্রে এর জন্য Krapsack sprayer, মাড়াইয়ের জন্য YAMAR এর ধান মাড়াই মেশিন অন্যতম অবদান রাখে ফলন বৃদ্ধিতে।

ধানের সর্বশেষ জাত

কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের বছরের শেষ সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে ব্রি উদ্ভাবিত পাঁচটি নতুন ধানের জাত:

(ক) ব্রি ধান ৮২,৮৩,৮৪,৮৫ ও ৮৬।

ধানের পুষ্টিগুণ

উপাদান	পরিমাণ (১০০ গ্রামে)
পানি	১২
কার্বোহাইড্রেট	৮০
শক্তি	১৫২৮ কিলোজুল
আমিষ	৭.১

উপাদান	পরিমাণ (১০০ গ্রামে)
স্নেহ/চর্বি	০.৬৬
আঁশ	১.৩
চিনি	০.১২

তাছাড়া জিংক সমৃদ্ধ ধান জাতে জিংকের পরিমাণ বেশি থাকে। যা শিশুদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ধান কাটা মাড়াই এবং সংরক্ষণ

ধান কাটা: মৌসুম অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে ধান কাটা হয়। ধান কাস্তে দিয়ে কিংবা মেশিন দিয়ে কাটা হয়। শীষের রং সবুজ হতে হলুদ এবং পাতার রং সবুজ হতে সোনালী রং ধারণ করলে দেখে বোঝা যায় যে ধান কাটার উপযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া শীষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত আকার ধারণ করলে এবং ধানের নিচের অংশে ২০ ভাগ ধানের চাল আংশিক শক্ত ও স্বচ্ছ হলে কেটে নেওয়া হয়। এর উপস্থিতির কারণে ধান কাটার সময় খচখচ শব্দ হয়।

ধান মাড়াই

ধান কাটার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাড়াই করতে হবে। মাঠে কিংবা আঙিনায় মাড়াই করতে চাটাই, চট হোগলা বা পলিথিন বিছিয়ে নিতে হবে। তাতে ধানের রঙ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে। মাড়াই করার পর ধান অন্তত ৪-৫ দিন রোদে ভালো ভাবে শুকিয়ে নিতে হবে যেন আর্দ্রতা শতকরা ১২% এর নিচে থাকে। পূর্বে হাত দিয়ে ধান মাড়াই করা হতো, গরুর ঘানি টেনেও মাড়াই করা হতো কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ধানমাড়াই করা হয় মেশিন দিয়ে। ফলে কৃষকের কষ্ট দূর হওয়ার পাশাপাশি সময় ও বাঁচছে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ

পুষ্ট ধান বাছাই করতে কুলা দিয়ে কমপক্ষে দুইবার অথবা ধানের পরিমাণ বেশি হলে ব্রি পাওয়ার উইনোয়ার দ্বারা ঝাড়াই করা যায়। ঝাড়াই করার পর ৪৫ দিন ভালোভাবে রোদে শুকাতে হবে।

সংরক্ষণ

ধান মূলত বীজ হিসেবে কিংবা খাদ্যশষ্য হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।
শুকনো ধান ঠান্ডা করে বস্তা বা চটের ব্যাগে, আর্দ্রতা রোধক মোটা পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হবে। ধান সংরক্ষণের জন্য আর্দ্রতার পরিমাণ ১৪% এর নিচে রাখতে হবে। অথবা দাঁত দিয়ে কাটলে যাতে কটকট শব্দ হয় সে পর্যন্ত রোদে শুকাতে হবে।
* টন প্রতি ধানে ৩.২৫ কেজি নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালী শুকনা পাতার গুঁড়া মিশিয়ে সংরক্ষণ করা হলে পোকার আক্রমণ হয় না।

* ধান বস্তা ভর্তি করে স্যাতস্যাতে বা অন্ধকার ঘরে রাখা যাবে না। ঘরে যাতে আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং বস্তাগুলো উঁচু স্থানে রাখতে হবে।

পরিবহন ও বাজারজাতকরণ

পূর্বে সংরক্ষণকৃত ধান বীজ হিসেবে বা খাদ্যশস্য হিসেবে বাজারে বাজারজাত করা হয়। বাজারজাত করণের সাথে পরিবহণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধান বাজারজাতকরণ কিংবা পরিবহনের সময় ট্রাক/ভ্যান, পিক আপ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। বাজার অঞ্চলভিত্তিক ভাবে খোলা জায়গায় বসে। বাজারজাতকরণের সময় অবশ্যই ক্রেতা-বিক্রেতার সৌহাদ্যপূর্ণ আচরণ থাকতে হবে। বাজারমূল্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। কৃষক যাতে ন্যায্য দাম পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করার চেষ্টা মাঠকর্মী থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সবারই থাকতে হবে।

যা না জানলেই নয়

১. ধানের মৌসুম
২. কোন মৌসুমে কোন জাত লাগাবো
৩. জমি তৈরীর পদ্ধতি
৪. ধান চাষে দ্বি-রোপন পদ্ধতি
৫. সেচ ব্যবস্থাপনা
৬. ধানের বিভিন্ন রোগবালাই ও প্রতিকার
৭. সেচের পানি অপচয়রোধে করণীয়

ধানক্ষেতে সেচের পানি অপচয় রোধে করণীয়

বোরো মৌসুম ধানের জমিতে বেশি সেচ লাগে এবং এ সময় জমির আইল ঢিলা থাকে। ফলে পানি বের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অপচয় রোধকল্পে পিভিসি/প্লাস্টিকের পাইপ ব্যবহার করত হবে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সেচ দিলে শতকরা ৪০-৪২ ভাগ পানির অপচয় কমে। এ পদ্ধতির নাম A Herrate waiting and drying (AWD) । এ পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে ভিজানো এবং শুকানো পদ্ধতিতে সেচ চলবে জাত ভেদে ৪০-৫০ দিন পর্যন্ত। ২-৫ সে.মি. হারে পানি দেওয়া হয় (গাছের থোড়-দানা) হওয়া পর্যন্ত।

বাজারজাতকরণ

নিরাপদ কৃষি পণ্য (সুগন্ধী ধান) প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সরবরাহের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাধীন বিটিএ মুড়ির মিল, ভূল্লি বাজারে উন্নয়নকৃত নির্ধারিত নিরাপদ কৃষিপণ্য কালেকশান পয়েন্টে ন্যায্য দামে কন্ট্রাক্ট ফার্মার গন বিক্রয় করতে পারবে। অপরদিকে সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার লোকজন এসে নিরাপদ কৃষি পণ্য (সুগন্ধী ধান) প্রক্রিয়াজাতকরনের উদ্যেশ্যে সঠিক দামে ক্রয় করে নিয়ে যাবে।

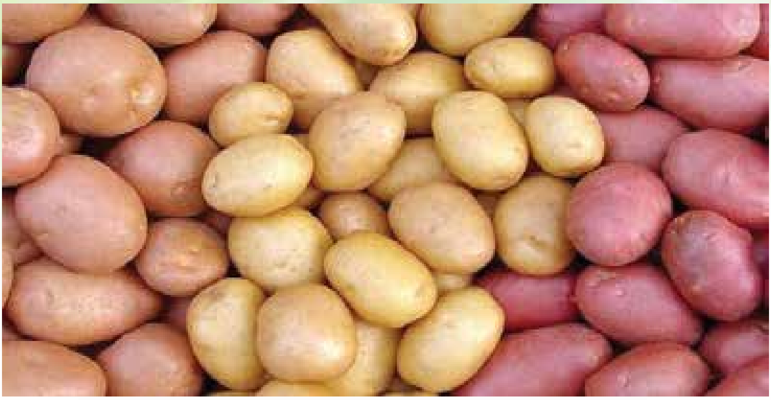

আলু

আলু বিশ্বের অন্যতম প্রধান ফসল। উৎপাদনের দিক থেকে ধান, গম ও ভুট্টার পরই চতুর্থ স্থানে আছে আলু। বাংলাদেশের সর্বত্রই আলু চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে আলু সাধারণত সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। বিভিন্ন তরকারির সাথে খেতে খুবই মুখরোচক। প্রক্রিয়াজাত আলু বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। আলু একটি স্টার্চ প্রধান খাদ্য এবং আলু মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য যা ভাতের বিকল্প হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর অন্তত ৪০ টি দেশে আলু মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য।

বর্তমানে বাংলাদেশে আলু হেক্টর প্রতি গড় ফলন মাত্র ১১ টন। ফলন বাড়লে উৎপাদন ২০ টন পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। ফলন বাড়লে উৎপাদন খরচ কমে আসবে। ভাতের বদলে আলু খেলে চালের উপর বাড়তি চাপ কমে আসবে। বিশেষ করে ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ভাতের বদলে যদি আলু মাঝে মাঝে খাওয়া হতো তাহলে চালের উপর নির্ভরতা অনেক কমে যেত।

আলুর জাত নির্বাচন

ভালো জাতের আলু চাষ করলে একদিকে চাষি আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে আবার অন্য দিকে ফলনও আশানুরূপ পাওয়া যায়। তাই জাত নির্বাচন অবশ্যই গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশে দেশি ও উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাতের আলু চাষ হয়ে থাকে। বর্তমানে আলু চাষের মোট জমির শতকরা ৬৫ ভাগ জমিতে উন্নত জাতের আলু, ৩৫ ভাগ জমিতে দেশি জাতের আলুর চাষ হয়ে থাকে।

দেশি জাত

ফলন কম হলেও দেশি জাতের বৈশিষ্ট্য হলো দীর্ঘদিন ঘরে রেখে খাওয়া যায়। দেশি জাতের আলু ছোট ও ওজন ৫ থেকে ৪৮ গ্রাম। দেশি জাতের আলু তুলনামূলক খেতে খবুই সুস্বাদু। বর্তমানে বাজারমূল্যে উন্নত জাতের চেয়ে দেশি জাতের আলু বেশি

দামে বিক্রি হয়। দেশি জাত সমূহের মাঝে আউশা, চল্লিশা, দোহাজারী লাল, ফেইন্তাশীল, হাসরাই, লাল পাকরী, লালশীল পাটনাই, সাদা গুটিশীল বিলাতী ও সূর্যমুখী উল্লেখযোগ্য। দেশিজাত গুলো বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় তাই জাত নির্বাচনের সময় রোগমুক্ত বীজ সংগ্রহ করে লাগানো উচিত।

উচ্চ ফলনশীল

১৯৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত যেসব উন্নত জাতের আলু চাষ হচ্ছে তার মধ্যে হিরা, আইলমা, পেট্রোনিম, মুল্টা ডায়মন্ট, কার্ডিনাল, মন্ডিয়াল, কুফরী সিন্দুরী, চমক ধীরা গ্রানোলা, ক্লিওপেট্রা ও চিনেলা জাতটি সবচেয়ে বেশি চাষ হয়েছে। বারি টিপিক্রস-১ এবং বারি টিপিক্রস-২ নামে ২টি হাইব্রিড জাতের আলু বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়াও বারি আলু-১ (হীরা), বারি আলু-৪ (আইলমা), বারি আলু ৭ (ডায়ামন্ট), বারি আলু-৮ (কার্ডিনাল), বারি আলু-১১ (চমক), বারি আলু-১২ (আরিন্দা), বারি আলু-১৭ (রাজা), বারি আলু-১৮ (বারাকা), বারি আলু-১৯ (বিন্টেজে) এবং বারি আলু-২০ (কারলা) জাত রয়েছে। এসব জাত কৃষি গবেষণা থেকে উদ্ভাবিত।

উৎপাদন পদ্ধতি

বাংলাদেশের কৃষক আলু উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু এগুলো বিজ্ঞান সম্মত নয়। তাই বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চাষ করলে একদিকে যেমন কৃষক লাভবান হবে অন্যদিকে ফলনও বাড়বে।

মাটি নির্বাচন

আলু চাষের জন্য বেলে দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী।

উৎপাদন মৌসুম

বাংলাদেশে সাধারণত নভেম্বর মাসের আগে আলু লাগানো যায় না। কারণ তার আগে জমি তৈরি সম্ভব হয় না। নভেম্বরের পরে আলু লাগালে ফলন কমে যায়। এ জন্য উত্তরাঞ্চলে মধ্য-কার্তিক (নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ন ১ম সপ্তাহ হতে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ) আলু লাগানোর জন্য উপযোগী।

বীজের হার

প্রতি হেক্টরে ১.৫ টন। রোপনের দূরত্ব ৬০×২৫ সে.মি (আস্ত আলু) এবং ৪৫×১৫ সেমি কাটা আলু কৃষকেরা ঘরে সংরক্ষিত দেশি জাতের যে বীজ ব্যবহার করেন তা খুবই নিকৃষ্টমানের। কোনো কোনো সময় হিমাগারে থাকা অবস্থায় আলুর মাঝখানে কাল দাগ দেখা যায়। মাঝে থাকা অবস্থায় বা সংরক্ষণের সময় যদি উচ্চ তাপমাত্রায় (৩৫ ডিগ্রি সে. এর উপরে) থাকলে বা অক্সিজেন বিহীন অবস্থায় থাকলে এমনটি

হয়। এ রোগটিকে ব্ল্যাকহার্ট রোগ বলে। আবার যদি হিমাগারের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সে. এর নিচে চলে যায় তাহলে আলু শীতঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ধরনের আলু গজবে না, তাই কৃষক অবশ্যই এদিকটা বিবেচনা করে আলু বীজ সংগ্রহ করবেন।

বীজ শোধন

যদি সম্ভব হয় আলু বীজকে সারকিডরিক ফ্লোরাইড এক গ্রাম নিয়ে ২ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১-২ ঘন্টা ডুবিয়ে নিলে ভালো হয়। আবার বোরিক এসিডের ০.৫% দ্রবনে আলু বীজ ১৫-৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। কাটা বীজ বা গজানো বীজ শোধন করা যাবে না।

বীজের আকার

২৫-৩৫ গ্রাম ওজনের বীজ রোপন করা সব দিক থেকে ভালো।

সারের পরিমান

কৃষকেরা যদি আলুর উচ্চ ফলন পেতে চান তাহলে সুষম সারের বিকল্প নেই। সাধারণ কৃষকের জন্য আলু চাষে নিম্মোক্ত হারে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

ইউরিয়া : ২২০-২৫০ কেজি/হেক্টর।

টিএসপি : ১২০-১৫০ কেজি/হেক্টর

এমওপি : ২২০-২৫০ কেজি/হেক্টর

জিপসাম : ১০০-১২০ কেজি/হেক্টর

জিংক সালফেট : ৮-১০ কেজি/হেক্টর

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট : ৮০-১০০ কেজি/হেক্টর

(অম্লীয় বেলে মাটির জন্য)

বোরণ : ৮-১০ কেজি/হেক্টর

গোবর : ৮-১০ টন/হেক্টর

জমিতে যদি সবুজ সার প্রয়োগ করা হয় তাহলে গোবরের প্রয়োজন নেই।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

গোবর, অর্ধেক ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক সালফেট আলু রোপনের আগেই মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ৩০-৩৫ দিন পর যখন আলুর নালা তৈরি করে মাটি তোলার সময় দিতে হবে।

জলবায়ু

আলু চাষের জন্য তাপমাত্রা ও আলোর প্রভাব খুবই প্রকট, দেখা গেছে ১৫ ডিগ্রি-২০ ডিগ্রি সে. গড় তাপমাত্রা আলু চাষের জন্য খুবই উপযোগী। ২০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রার ওপরে গেলে ফলন কমতে থাকে আবার ৩০ ডিগ্রি সে. এ আলু উৎপাদন ক্ষমতা লোপ পায়। আবার ১০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রার নিচে গেলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। এজন্য আলু লাগানোর সময় ২০ ডিগ্রি ২৫ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ তাপমাত্রার গাছ দ্রুত গজায়। আবার বাংলাদেশে দেখা গেছে যে বছর মেঘমুক্ত আকাশ ও তাপমাত্রা সঠিকভাবে থাকে সে বছর আলুর গড় ফলন ১০-১৫% বেড়ে যায়।

পরিচর্যা

আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিনের পর গোড়ায় মাটি দেয়া দরকার এবং সেই সাথে আগাছা দমন করতে হবে।

রোগ ও পোকামাকড়/রোগের প্রতিকার: আলু মাঠে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন রোগ দেখা যায়। এর মধ্যে আলুর মড়ক রোগ, আলুর আগাম রোগ যা পাতা পোড়ানোর বা কুঁচকে যাওয়ার মতো দেখায়, কান্ড ও আলু পঁচা রোগ, ঢলে পড়া ও বাদামি পচন রোগ, আলুর দাঁদ রোগ, আলু সোজাইক রোগ, আলুর শুকনো পঁচা রোগ, আলুর নরম পঁচা রোগ অন্যতম। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। রোগ দেখা দিলে সেচ দেয়া বাদ রাখতে হবে এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে বালাইনাশক দিতে হবে।

পোকামাকড় দমন

আলুর ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় দেখা যায়, এদের মধ্যে আলুর কাটুই পোকা অন্যতম। এ পোকার কীড়া বেশ শক্তিশালী, ৪০-৫০ মিমি লম্বা হয়। এ পোকা চারা গাছ কেটে দেয় এবং আলুতে ছিদ্র করে পলন ক্ষতিগ্রস্থ করে। কাটুই পোকার প্রকোপ বেশি না হলে কাটা আলু দেখে তার কাছাকাছি মাটি উলটপালট করে কীড়া খুঁজে বের করতে হবে এবং মারতে হবে। এছাড়াও প্রতি লিটার পানির সাথে জারসান ২০ ইসি ৫ মিলি করে মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটি ভিজিয়ে ৩০-৪০ দিন পর স্প্রে করতে হবে। আলুর সুতলি পোকাও আলুর উৎপাদন বাধাগ্রস্থ করে। এ পোকা দেখতে ছোট, ঝালরযুক্ত, সরু ডানা বিশিষ্ট ধূসর বাদামি রঙ্গের হয়ে থাকে। পূর্ণাঙ্গ পোকা আলুর মধ্যে লম্বা সুড়ঙ্গ করে আলুর ক্ষতি করে থাকে। কৃষকের বাড়িতে রাখা আলু এ পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফসল সংগ্রহ

উচ্চ ফলনশীল জাতে ৮০-১০০ দিন লাগে পরিপক্কতা আসতে। দেশি জাতে সময় বেশি লাগে। বাংলাদেশে উচ্চফলনশীল জাতের হেক্টর প্রতি ফলন ১৩-১৪ টন এবং দেশি ৭-৮ টন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করলে উচ্চফলনশীল জাতে ২০ টনের অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব।

বাজারজাতকরণ

নিরাপদ কৃষি পণ্য (আলু) প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সরবরাহের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাধীন ফারাবাড়ী বাজারে উন্নয়নকৃত নির্ধারিত নিরাপদ কৃষিপণ্য কালেকশান পয়েন্টে ন্যায্য দামে কন্ট্রাক্ট ফার্মার গন বিক্রয় করতে পারবে। অপরদিকে সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার লোকজন এসে নিরাপদ কৃষি পণ্য (আলু) প্রক্রিয়াজাতকরনের উদ্যেশ্যে সঠিক দামে ক্রয় করে নিয়ে যাবে।

চালকুমড়া

গ্রামবাংলায় ঘরের চালে এ সবজি গাছ উঠানো হয় বলে এটি চাল কুমড়া নামে পরিচিত। তবে জমিতে মাচায় ফলন বেশি হয়। কচি ফল (ঝালি) তরকারি হিসাবে এবং পরিপক্ব ফল মোরব্বা ও হালুয়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
চালকুমড়ায় রয়েছে: খাদ্যশক্তি, আমিষ, শর্করা, ফাইবার, চর্বি, ভিটামিন সি, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, কোলেস্টেরল, লৌহ, জিংক, ফরফরাস। আয়ুর্বেদের মতে, চালকুমড়া রক্তের দোষ অর্থাৎ রক্ত বিকার দূর করে, বায়ুর প্রকোপ কমিয়ে দেয়। কচি কুমড়া শীতল পিত্তনাশক।

চালকুমড়ার জাত

বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি চালকুমড়া-১ নামের জাতটি বাংলাদেশের সব অঞ্চলে চাষ করা যায়।

মাটি

দোআঁশ মাটিতে এটি চাষ করা হয়। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাদা মাটি ছাড়া যে কোনো মাটিতে চাষ করা যায়।

চাষের সময়

ফেব্রুয়ারি থেকে মে।

মাদা তৈরি

জমি ভালোভাবে চাষ করে মই দিয়ে ঢেলে ভেঙ্গে সমান করতে হবে। জমিতে মাদার উচ্চতা হবে ১৫-২০ সে:মি:, প্রস্থ হবে ২.৫ মিটার এবং লম্বা জমির সুবিধামতো নিতে

হবে। এভাবে পর পর মাদা তৈরি করতে হবে। এরূপ পাশাপাশি দুইটি মাদার মাঝখানে ৬০ সে:মি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে। পারিবারিক বাগানে চালকুমড়ার চাষ করতে হলে মাদায় চারা গজালে তা খাঁচা ঘরের চাল কিংবা কোনো বৃক্ষের উপর তুলে দেওয়া হয়। মাদায় সার প্রয়োগ: প্রতি মাদায় গোবর ১০ কেজি, টিএসপি ২০০ গ্রাম, এমওপি ৫০ গ্রাম দিতে হবে।

মাদার গর্তে বীজবপন

প্রতি মাদায় সারিতে ৪-৫ টি বীজ বপন করতে হবে। ৫-৭ দিনের মধ্যেই বীজগুলো গজাবে। চারা গজানোর কয়েকদিন পর প্রতি মাদায় ২-৩ টি সবল গাছ রাখতে হবে।

পরিচর্যা

মাদা শুকিয়ে গেলে সেচ দিতে হবে। বর্ষার পানি জমলে তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের গোড়ায় মাটি উঠিয়ে দিতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা

ফলের মাছি পোকা, রেড পামকিন বিট, ইপিল্যাকনা বিটল, লাল মাকড় প্রভৃতি পোকা ফলের ক্ষতি করে থাকে। কীটনাশক প্রয়োগ করে এসব পোকা দমন করা যায়। এছাড়া পাউডারি মিলিডিও পাতার উপরে সাদা পাউডার এবং ডাউনি মিলিডিউ পাতার নিচে ধূসর বেগুনি রং প্রভতি রোগ পাতার ক্ষতি করে গাছকে দুর্বল করে ফেলে। ছাত্রাক নাশক পাতায় বোর্দো মিক্সার প্রয়োগ করে এসব রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

চালকুমড়ার বাজারজাতকরণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহণ ব্যবস্থা

বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা

ভ্যান, ট্রলি, পিকাপ, ট্রাক, লঞ্চ, শীতাতপ কাভার্ড ভ্যান, কার্গো বিমানে।

প্রথাগত বাজারজাতকরণ

বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে স্থানীয় হাট বাজারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাতকরণ

গ্রেডিং/বাছাইয়ের পরে প্যাকেটজাত করে।

বাজারজাতকরণ

নিরাপদ কৃষি পণ্য (চালকুমড়া) প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সরবরাহের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাধীন ফারাবাড়ী বাজারে উন্নয়নকৃত নির্ধারিত নিরাপদ কৃষিপণ্য কালেকশান পয়েন্টে ন্যায্য দামে কন্ট্রাক্ট ফার্মার গন বিক্রয় করতে পারবে। অপরদিকে সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার লোকজন এসে নিরাপদ কৃষি পণ্য (চালকুমড়া) প্রক্রিয়াজাতকরনের উদ্যেশ্যে সঠিক দামে ক্রয় করে নিয়ে যাবে।

চীনা বাদাম

চীনাবাদাম একটি অর্থকারী ফসল। এটি একটি উৎকৃষ্ট ভোজ্য তেল বীজ। বীজে ৪৮-৫০% তেল ও ২২-২৯% আমিষ রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমিতে চীনাবাদাম চাষ করা হয়। চীনা বাদামের মোট উৎপাদন প্রায় ৪৭ হাজার মে. টন। উচ্চ ফলনশীল জাতের ব্যবহার ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে বাংলা দেশের চীনাবাদামের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

চীনাবাদাম C3 শ্রেণিভুক্ত একটি শুটি জাতীয় ফসল। তবে C4 ফসলের ন্যায় প্রখর সূর্যালোকে চীনাবাদাম পাতায় উচ্চ হারে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ঘটে। তীব্র আলোর প্রতি চীনাবাদাম গাছের উপরিভাগ অধিক সংবেদনশীল। কম সূর্যালোকের কারণে গাছের উপরিভাগের পাতা পূর্ণ মাত্রায় সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে না। বীজের অংকুরোদগম থেকে শুরু করে সকল প্রকার বৃদ্ধি ও বিকাশে তাপমাত্রা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অধিক তাপমাত্রায় বীজের আকার ছোট হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে দশটি উন্নত জাতের চীনাবাদাম উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাতগুলো বিস্তারিতভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

উন্নত জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে চাষাবাদকৃত ঢাকা-১ (মাইজচর) জাতের বীজে প্রথমে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এর স্থায়ী কৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে একটি মিউট্যান্ট বা প্রজনন সারি পাওয়া যায়। যার নামকরণ করা হয় মিউট্যান্ট-৬ (Mut-6)|

১৯৯৪ সালে এ প্রজনন সারিটিকে আবার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে M6/20/42 M(2), M6/20/44-3 I M6/20/62-4 এই তিনটি মিউট্যান্ট/প্রজনন সারি পাওয়া যায়। এই প্রজননগুলি মাতৃজাত ঢাকা-১ (মাইজচর) থেকে অনেক বেশি ফলন দেয় বলে এগুলিকে যথাক্রমে বিনা চীনাবাদাম-১, বিনা চীনাবাদাম-২ ও বিনা চীনাবাদাম-৩ নামে ২০০০ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড সারা দেশের কৃষক পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

সারণী:১

বিনা চীনাবাদাম-১, বিনা চীনাবাদাম-২ ও বিনা চীনাবাদাম-৩ এই তিন জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য:

বৈশিষ্ট্য	বিনা চীনাবাদাম-১	বিনা চীনাবাদাম-২	বিনা চীনাবাদাম-৩
গাছের উচ্চতা	গড়ে ৩২ সে.মি.	গড়ে ২৮ সে.মি.	গড়ে ৩০ সে.মি.
পত্রফলক	মাতৃ জাতের চেয়ে বেশি সবুজ মোমের আস্তরণযুক্ত।	ছোট গাঢ় সবুজ, ডিম্বাকৃতির, বিনাচীনা বাদাম-৩ এর চেয়ে চ্যাপ্টা।	গাঢ় সবুজ, বিনা চীনাবাদাম-২ এর চেয়ে কম চ্যাপ্টা, লম্বা, ও বর্শাকৃতির
ফল ও বীজ	ঢাকা-১ অপেক্ষা ফল ২৬% ও বীজ ৩০% বড়, বীজ আবরণ সাদাটে।	ঢাকা-১ অপেক্ষা ফল ২৪% ও বীজ ২৮% বড়, বীজ আবরণ তামাটে।	ঢাকা-১ অপেক্ষা ফল ২৭% ও বীজ ৪০% বড়, বীজ আবরণ তামাটে
রোগবালাই	কলার রট, সার্কোস্পোরা পাতার দাগ ও মরিচা রোগ সহনশীল।	কলার রট, সার্কোস্পোরা পাতার দাগ ও মরিচা রোগ সহনশীল	কলার রট, সার্কোস্পোরা পাতার দাগ ও মরিচা রোগ সহনশীল
বিছাপোকার আক্রমণ	মাতৃজাতের মতই	মাতৃজাত অপেক্ষা আক্রমণ কম	মাতৃজাত অপেক্ষা আক্রমণ কম
জীবনকাল শীত মৌসুম গ্রীষ্ম/শরৎ মৌসুম	১৫০-১৬০ দিন ১২৫-১৩৫ দিন	১৫০-১৬০ দিন ১২৫-১৩৫ দিন	১৫০-১৬০ দিন ১২৫-১৩৫ দিন
সর্বোচ্চ ফলন (খরিফ-১ মৌসুম)	২.৩৭ টন/হে ০.৯৬ টন/একর	১.৬৬ টন/হে ০.৬৭ টন/একর	১.৫৫ টন/হে ০.৬৩ টন/একর
বীজে তেলের পরিমাণ (%)	৪৭	৫০	৫২
বীজে আমিষের পরিমাণ (%)	২৮	২৮	২৯

বিনা চীনাবাদাম-৪

ঢাকা-১ জাতের বীজে ২০০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এর স্থায়ী কৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে একটি মিউট্যান্ট বা প্রজনন সারি পাওয়া যায়, যার নামকরণ করা হয় D1/20/3M-30। এই মিউট্যান্টটি বিভিন্ন ফলন পরীক্ষায় এর মাতৃজাত ঢাকা-১ থেকে অনেক বেশি ফলন দেয় এবং কলার রট, সার্কোস্পোরা লিফ স্পট ও ব্লাস্ট রোগ সহনশীল হওয়ায় বিনা চীনা বাদাম-৪ নামে বিগত ২০০৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড সারাদেশের কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

বিনা চীনাবাদাম-৫

এ জাতটি উদ্ভাবনের জন্য স্থানীয়ভাবে চাষাবাদকৃত ঢাকা-১ (মাইজচর) জাতের বীজ ২৫০ গ্রে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এর স্থায়ী কৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে একটি মিউট্যান্ট বা প্রজনন সারি পাওয়া যায় যার নামকরণ করা হয় মিউট্যান্ট-৩, পরবর্তীতে মিউট্যান্ট-৩ এর মধ্যে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি গাছ পাওয়া যায়, যা থেকে প্রাপ্ত পপুলেশনের নামকরণ করা হয় মিউট্যান্ট-৬। এই মিউট্যান্টটিকে আবার ২৫০ গ্রে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে M6/25/54-20 নামক একটি মিউট্যান্ট পাওয়া যায়। ২০১১ সালে মিউট্যান্টটি বাংলাদেশের লবণাক্ত এলাকার পটুয়াখালী ও নোয়াখালী অঞ্চলে কৃষক পর্যায়ে গবেষণার জন্য বিনা চীনাবাদাম-৫ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড অনুমোদন দেয়।

বিনা চীনাবাদাম-৬

বিনা চীনাবাদাম জাতটি উদ্ভাবনের জন্য স্থানীয়ভাবে চাষাবাদকৃত ঢাকা-১ (মাইজচর) জাতের বীজে ২৫০ গ্রে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এর স্থায়ী কৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে একটি মিউট্যান্ট বা প্রজনন সারি পাওয়া যায় যার নামকরণ করা হয় মিউট্যান্ট-৩। পরবর্তীতে মিউট্যান্ট-৩ এর গাছের মধ্যে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি গাছ পাওয়া যায়, যা থেকে প্রাপ্ত পপুলেশনের নামকরণ করা হয় মিউট্যান্ট-৬। এই মিউট্যান্টটিকে আবার ২৫০ গ্রে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে M6/25/64/82 নামক একটি মিউট্যান্ট পাওয়া যায়। ২০১১ সালে এটিকে জাতীয় বীজ বোর্ড বাংলাদেশের লবণাক্ত এলাকার খুলনা, নোয়াখালী, বাগেরহাট ও পটুয়াখালী অঞ্চলে কৃষক চাষাবাদের জন্য বিনা চীনাবাদাম-৬ নামে অনুমোদন দেয়।

সারণী: ২

বিনা চীনাবাদাম-৪, বিনা চীনাবাদাম-৫, বিনা চীনাবাদাম-৬ এই ৩ জাতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	বিনা চীনাবাদাম-৪	বিনা চীনাবাদাম-৫	বিনা চীনাবাদাম-৬
গাছের উচ্চতা	গাছ মাতৃ জাত অপেক্ষা ছোট	গাছ মাধ্যম আকৃতির ও খাড়া,	গাছ খাটো ও খাড়া গাছের উচ্চতা ১৬.৮১ সে.মি.

বৈশিষ্ট্য	বিনা চীনাবাদাম-৪	বিনা চীনাবাদাম-৫	বিনা চীনাবাদাম-৬
		গাছের উচ্চতা ২৫.৫৩ সে.মি.	
পত্রফলক	মাতৃজাতের চেয়ে লম্বা ফ্যাকাসে সবুজ	পত্রফলক লম্বা ডিম্বাকৃতির ও সবুজ	পত্রফলক লম্বা, ডিম্বাকৃতির ও হালকা সবুজ
ফল ও বীজ	মাতৃ জাত অপেক্ষা ফল ২৬% ও বীজ ৩০% বড়, বীজ সাদাটে	মাতৃ জাত অপেক্ষা ফল ১০% ও বীজ ১৫% বড়	মাতৃ জাত অপেক্ষা ফল ৩০% ও বীজ ৪০% বড়
রোগবালাই	কলার রট, সার্কোস্পোরা পাতার দাগ ও মরিচা রোগ সহনশীল	কলার রট, সার্কোস্পোরা পাতার দাগ ও মরিচা রোগ সহনশীল	কলার রট, সার্কোস্পোরা পাতার দাগ ও মরিচা রোগ সহনশীল
বিছাপোকার আক্রমণ	মাতৃ জাতের মতই	মাতৃ জাত অপেক্ষা আক্রমণ কম	মাতৃ জাত অপেক্ষা আক্রমণ কম
জীবনকাল শীত মৌসুম শরৎ গ্রীষ্ম মৌসুম	১৪০-১৫০ দিন ১০০-১২০ দিন	১৪০-১৫০ দিন	১৪০-১৫০ দিন
সর্বোচ্চ ফলন (শীত মৌসুম)	২.৬ টন/হে ১.০৪ টন/একর	২.১৪ টন/হে ০.৮৫ টন/একর	২.৪০ টন/হে ০.৯৬ টন/একর
সর্বোচ্চ ফলন (খরিফ-১ মৌসুম)	২.৪৭ টন/হে ০.৫৮ টন/একর	--	--
বীজে তেলের পরিমাণ (%)	৪৮.৬	৪৯.০	৪৮.৫১
বীজে আমিষের পরিমাণ (%)	২৭	২৫.৭২	২৮.৬৮

বিনা চীনাবাদাম-৫ এবং বিনা চীনাবাদাম-৬ নামের জাতগুলো ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া সময়ে ৮ ডিএস/সি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। প্রতি পড়ে দানার সংখ্যা মূলত ২ টি এবং পড়ে দানার শতকরা হার ৭৫-৭৭ ভাগ।

বিনা চীনাবাদাম-৭, বিনা চীনাবাদাম-৮ ও বিনা চীনাবাদাম-৯ ২০০৬ সালে ঢাকা-১ জাতের বীজে ২০০ গ্রে ও PK-1 জাতের বীজে ২৫০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ এবং নির্বাচনের মাধ্যমে D1/20/17-1 ও I RS/25-3-1 মিউট্যান্ট ২ টি পাওয়া যায়। এছাড়াও ঐ বছরই ঝিঙ্গা বাদামের সাথে ঢাকা-১ জাতের সংকরায়ণ এবং নির্বাচনের মাধ্যমে GC-1-24-1-1-2 প্রজনন সারিটি পাওয়া যায়। লবণাক্ত ও অলবণাক্ত এলাকায় ফলন পরীক্ষায় বেশিভাগ ক্ষেত্রে D1/20/17-1 ও RS/25/3-1 মিউট্যান্ট দুটি এবং GC-f-24-1-1-2 প্রজনন সারিটি স্ব-স্ব মাতৃজাত থেকে বেশি ফলন দিতে সক্ষম হওয়ায় ২০১৫ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড D1/20/17-1 কে বিনা চীনাবাদাম-৭, GC-1-24-1-1-2 কে বিনা চীনাবাদাম-৮ এবং RS/25/3-1 কে বিনা চীনাবাদাম-৯ নামে লবণাক্ত এলাকাসমূহ সারাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়। জাত ৩ টি ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া সময়ে ৮ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।

সারণী-৩: জাত ৩ টির বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	বিনা চীনাবাদাম-৭	বিনা চীনাবাদাম-৮	বিনা চীনাবাদাম-৯
লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতা	ফুল ফোঁটা থকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি.	ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি.	ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ৮ডিএস/মি.
গাছের উচ্চতা	মধ্যম আকৃতির	খাটো	মধ্যম আকৃতির
বাদাম ও দানার আকার	বাদাম ছোট ও দানা মধ্যম আকারের (১০০ বাদামের ওজন ৬০-৭০ গ্রাম ও দানার ওজন ৩০-৩৩ গ্রাম)	বাদাম ও দানা মধ্যম আকারের (১০০ বাদামের ওজন ৭০-৭৫ গ্রাম ও দানার ওজন ২৯-৩০ গ্রাম)	বাদাম ও দানা মধ্যম আকারের (১০০ বাদামের ওজন ৭০-৮০ গ্রাম ও দানরি ওজন ৩৪-৩৫ গ্রাম)
দানার হার (%)	৬০-৭৯	৬০-৭৯	৮২-৮৪
বীজে আমিষ ও তেলের পরিমাণ	যথাক্রমে ২৮.০ ও ৪৮.৩%	যথাক্রমে ২৮.১ ও ৪৬.৯ %	যথাক্রমে ২৩.৮ ও ৪৮.০১%
জীবন কাল	১৩৫-১৪৫ দিন	১৩৫-১৪৫ দিন	১৩৫-১৪৫ দিন
গড় ফলন (টন/হে)	স্বাভাবিক মাটিতে ২.৫২ ও লবণাক্ত মাটিতে ১.৮	স্বাভাবিক মাটিতে ২.৫৬ ও লবণাক্ত মাটিতে ১.৮	স্বাভাবিক মাটিতে ২.৯ ও লবণাক্ত মাটিতে ১.৯

বিনা চিনাবাদাম-১০

চাষ উপযোগী-এলাকা বান্দরবান, চকোরিয়াসহ সমগ্র বাংলাদেশে উৎপাদনাধীন এলাকা। প্রতি গাছে ২২-৩২ টি বাদাম ধরে। বাদাম মধ্যম আকারে (১০০ বাদামের ওজন ৭০-৭৫ গ্রাম)। দানার রং ও আকার তামাটে লাল রঙের ও মাঝারি। ৭২-

৭৫% বীজে আমিষ ২৮.১০% ও তেলের পরিমাণ ৫০.৬%। জীবনাকাল ফেব্রুয়ারি মাসে রোপন করলে ১২৫-১৩০ দিন এবং খরিফ-২ মৌসুমে ১১০-১২০ দিন। গড় ফলন ফেব্রুয়ারি মাসে রোপন করলে ২.৮ টন/হে ও খরিফ-২ মৌসুমে ২.২ টন/হে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ঃ চীনাবাদাম চাষের জন্য হালকা বেলে-দোআঁশ ও চরাঞ্চলের বেলে মাটি বেশি উপযোগী। চীনাবাদাম জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়। চীনাবাদামের গর্ভদন্ড বা পেগ যাতে সহজে মাটি ভেদ করে নিচে যেতে পারে এবং বাদাম সহজে পুষ্ট হতে পারে, সেজন্য সুনিষ্কাশিত হালকা বেলে-দোআঁশ মাটির প্রয়োজন হয়। মাটির পিএইচ ৬.০-৬.৫ এ ফসল ভালো হয়।

জমি তৈরি

জমিতে ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুর করে নিতে হবে। শেষ চাষের সময় মই দিয়ে সমান করে জমির চার পাশে নালার ব্যবস্থা করে নিতে হবে যাতে পানি নিষ্কাশনে সুবিধা হয়। লবাণাক্ত এলাকায় রোপনের সময় মাটির লবণাক্ততা ৫ ডিএস/মি এর কম হবে।

বপনের সময়

চীনাবাদাম রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমে আবাদ করা যায়। রবি মৌসুমে কার্তিক অগ্রহায়ণ, খরিফ-১ মৌসুমে ফাল্গুন-চৈত্র ও খরিফ-২ মৌসুমে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বপন করতে হয়। তবে দেবীগঞ্জ, লক্ষীপুর, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ ফসল জানুয়ারিতে বপন করা হয়। রবি মৌসুমে কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহ বপন করলে ফলন ভালো পাওয়া যায় এবং জীবনকাল প্রায় ১৫-২০ দিন কমে আসে।

বীজের হার: জাত অনুযায়ী বীজের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

জাতের নাম	হেক্টর প্রতি খোসাসহ কেজি	একর প্রতি খোসাসহ কেজি
বিনা চীনাবাদাম-১	১৫০-১৬০	৬০-৬৫
বিনা চীনাবাদাম -২	১৫০-১৬০	৬০-৬৫
বিনা চীনাবাদাম -৩	১৫০-১৬০	৬০-৬৫
বিনা চীনাবাদাম -৪	১৩০-১৪০	৫২-৫৬
বিনা চীনাবাদাম -৫	১২০-১২৫	৪৮-৫০
বিনা চীনাবাদাম -৬	১২৫-১৩০	৫০-৫২
বিনা চীনাবাদাম -৭	১১০-১২০	৪৫-৫০
বিনা চীনাবাদাম -৮	১৪০-১৫০	৫৭-৬০
বিনা চীনাবাদাম -৯	১৪০-১৫০	৫৭-৬০
বিনা চীনাবাদাম -১০	১৪০-১৫০	৫৭-৬০

বীজ শোধন

বপনের আগে বীজ শোধন করা ভালো। প্রতি ৪০০ গ্রাম বীজে ১ গ্রাম প্রোড্যাক্স বা অটোস্টিন বা নোইন নামক বীজ শোধনকারী ছাত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে। শোধিত বীজ জমিতে বপন করলে চারা গজানোর হার বেড়ে যাবে। গজানোর পর অনেক সময় পিপড়া ও পাখি বাদামের দানা ও চারাগাছ উঠিয়ে ফেলে, এক্ষেত্রে বীজ বপনের সময় সেভিন ডাস্ট ও ফুরাডান মিশিয়ে বীজ বপন করা ভালো।

বপন পদ্ধতি

বীজ সারিতে লাগাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সে:মি: (১২ ইঞ্চি) এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ১৫ সে.মি. (৬ ইঞ্চি)। বীজগুলো মাটির ২.৫-৪.০ সে.মি. গভীরে বুনতে হবে।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	হেক্টর প্রতি (কেজি)	একর প্রতি (কেজি)
ইউরিয়া	৪০-৫০	১৬-২০
টিএসপি	১৬৫-১৭৫	৬৭-৭১
এমওপি	১৩০-১৪০	৫৩-৫৭
জিপসাম	১১০-১২০	৪৫-৪৯
জীবানুর বীজের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে	২.২	১.০
জিংক	২.৫-৫.০	১.০-২.০
বোরন	৩.০-৫.০	১.২-২.০
মলিব ডেনাম	১.০-১.৫	০৪.-০.৬

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

সব জমিতে বোরন, দস্তা ও মলিবডেনাম প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। যে জমিতে উক্ত সারের অভাব আছে কেবলমাত্র সেইসব জমিতেই প্রয়োগ করতে হবে। বপনের সময় প্রতি কেজি বীজের জন্য ৪০ গ্রাম জীবানু সার দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। জীবাণু সার দিলে ইউরিয়া সার দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

সেচ প্রয়োগ

চীনাবাদাম চাষে সেচের প্রয়োজন হয় না। জমিতে সঞ্চিত রসের উপর নির্ভর করেই এই ফসল আবাদ করা যায়। তবে শুষ্ক অঞ্চল তীব্র রৌদ্রে এবং নিম্ন আদ্রতায় সেচ দেওয়া হলে উচ্চ ফলন পাওয়া যেতে পারে।

ক্ষতিকর পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থাপনা

পিপীলিকা : বীজ বপনের পরে পিপীলিকা খেয়ে ফেলতে পারে তাই বপনের পর ক্ষেতের চারদিকে সেভিন ডাস্ট ৮৫ এসপি ছিটিয়ে দিলে বীজ নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে না। এছাড়া ক্ষেতের চারদিকে লাইন টেনে কেরোসিন তেল দিয়েও পিপীলিকা দমন করা যায়।

উঁইপোকা: এরা গাছের প্রধান শিকর কেটে দেয় এবং শিকড়ের ভিতর গর্ত সৃষ্টি করে বিধায় গাছ মারা যায়। উঁইপোকা মাটির নিচের বাদামের খোসা ছিদ্র করে বীজ খেয়ে ফেলে।

প্রতিকার

- কেরোসিন মিশিয়ে পানি সেচ দিলে উঁইপোকা জমি ত্যাগ করে।
- পাট কাঠির ফাঁদ তৈরি করে এ পোকা কিছুটা দমন করা যায়। মাটির পাত্রে পাট কাঠি ভর্তি করে রাখলে তাতে উঁইপোকা লাগে। তারপর ঐ কাঠি ভর্তি পাত্র তুলে উঁইপোকা মারতে হয়।
- আক্রান্ত মাঠে ডায়াজিনন-১০ জি/বাসুডিন-১০ জি বা ভাসবান যথাক্রমে প্রতি হেক্টরে ১৫, ১৪, ও ৭.৫ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে।

চীনাবাদামের পাতা ছিদ্রকারী পোকা

এই পোকার কীড়া পাতার ভিতরে অবস্থান করে সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। অধিক আক্রান্ত গাছ পুড়ে যাওয়ার মত মনে হয়।

পাতা মোড়ানো পোকা: এই পোকার কীড়া ছোট পাতাগুলোকে মুড়িয়ে ভিতরে বসে সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে ফলে পাতা সাদা হয়ে যায়।

বিছা পোকা: এই পোকার কীড়া দলবদ্ধভাবে পাতার নীচে থেকে সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে জালের মতো করে ফেলে।

জ্যাসিড বা পাতা হপার: অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পূর্ণাঙ্গ পোকা গাছের পাতার রস শোষণ করে। প্রথমে পাতার কিনারা হলুদ তামাটে পরে লালচে রং ধারন করে। এ পোকা ভাইরাস রোগের বাহক হিসেবেও কাজ করে।

জাব পোকা: বাচ্চা ও পূর্ণ বয়স্ক জাব পোকা পাতার উল্টো দিক থেকে রস শোষণ করে থাকে। আক্রমণের ফলে পাতা কিছুটা কুকড়ে যায়।

পাতা ছিদ্রকারী পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, বিছা পোকা, জ্যাসিড বা পাতা হপার এবং জাব পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থা:

- বিনা চীনাবাদাম-৭ জাতটি জ্যাসিড ও পাতা মোড়ানো পোকা এবং বিনা চীনাবাদাম-৮ ও বিনা চীনাবাদাম-৯ জাত দুটির জ্যাসিড পাতা মোড়ানো ও বিছা পোকার আক্রমণ সহ্য ক্ষমতা বেশি।
- আলোর ফাঁদ পেতে ও আক্রান্ত ক্ষেতে ডাল-পালা পুঁতে পতঙ্গভূক পাখি বসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- জাব ও জ্যাসিড বা পাতা হপারের ক্ষেত্রে পরজীবী ও পরভোজী উভয় ধরণের পোকার বংশ বৃদ্ধি করতে হবে।
- বিছা পোকার ক্ষেত্রে আক্রমণের প্রথম অবস্থায় পাতার নিচে দলবদ্ধ বিছাগুলোকে সংগ্রহ করে মাটির নিচে পুঁতে অথবা কোন কিছু দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে হবে।
- পাতা ছিদ্রকারী ও পাতা মোড়ানো পোকা দমনের জন্য ১০ লিটার পানির সাথে ২০ মিলি ক্লাসিক ২০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। বিছা পোকার ক্ষেত্রে ১০ লিটার পানির সাথে ১১ মিলি রিপকার্ড ১০ ইসি মিশিয়ে অথবা সাইথ্রিন ১০ ইসি একই মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- চীনা বাদামের জ্যাসিড বা পাতা হপারের ক্ষেত্রে ১০ লিটার পানিতে ১১ মিলি সিমবুশ ১০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- জাব পোকার আক্রমণ হলে ১০ লিটার পানিতে ১১ মিলি সাইথ্রিন ১০ ইসি বা ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি ২০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

চীনাবাদামের পাতার দাগ রোগ

আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে আগাম দাগ রোগ বপনের ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে দেখা দিতে পারে। ফলে পাতার উপরিভাগে গাঢ় বাদামী রং এর উপবৃত্তাকার দাগ এবং পাতার নিচের দিকে হাল্কা বাদামী রং এর ছাপ পড়ে। রোগের আক্রমণ যখন খুব বেশি হয় তখন ছোট ছোট উপ-বৃত্তাকার দাগগুলো মিলে বড় দাগের সৃষ্টি হয়ে পাতার সবুজ রং নষ্ট করে ফেলে। ফলে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং পাতা গাছ থেকে অকালে ঝড়ে পড়ে। আগাম পাতার দাগ রোগ ও বিলম্বে আসা দাগ রোগের মধ্যে পার্থক্য হলো আগাম দাগ রোগের ক্ষেত্রে দাগগুলো অপেক্ষাকৃত হাল্কা রঙের হয় এবং দাগের চতর্দিকের সবুজ রং নষ্ট হয়ে গর্তের মতো ক্ষতের সৃষ্টি করে।

চীনাবাদামের মরিচা রোগ

বিলম্বে আসা দাগ রোগ ও মরিচা রোগ সাধারণত একই সাথে চীনাবাদামকে আক্রমণ করে। প্রাথমিক অবস্থায় পাতার নিচের পিঠে কমলা রঙের সামান্য উঁচু বিন্দুর মত দাগ দেখা যায় এবং এটা ফেটে গিয়ে লাল-বাদামী রঙের স্পোর বের হয়ে আসে। আক্রমনের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাতার উপরের পিঠেও এ দাগ দেখা যায়। ফুল ছাড়া মাটির উপরের যে কোন অঙ্গে দাগ দেখা যেতে পারে। তবে কান্ডের গায়ে সৃষ্ট

দাগ লম্বাকৃতির হয়। মরিচা রোগে আক্রান্ত পাতাগুলোতে ধীরে ধীরে শক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে শুকিয়ে যায় এবং গাছের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় লেগে যায়।

চীনাবাদামের পাতার দাগ ও মরিচা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। পাতার দাগ রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে গাছে ব্যাভিষ্টিন নোবরিন ৫০ ডব্লিউপি ২ গ্রাম হারে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে প্রতি ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার ছিটালে রোগের প্রকোপ কমে যায়। এ ক্ষেত্রে ইন্ডোফিল এম ৪৪ ডায়থেন এম ৪৫ প্রতি লিটার পানি সাথে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর ২ বার ব্যবহার করা যায় অথবা ফলিকুর প্রতি লিটার পানির সাথে ১.মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

* বিনা চীনাবাদাম-৮ জাতটির মরিচা পড়া রোগ সহ্যক্ষমতা বেশি। তারপরও এ রোগ দেখা দিলে ফলিকুর নামক ছত্রাক নাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি হারে মিশিয়ে স্পে করা যেতে পারে। অথবা ইন্ডোফিল এম-৪৪ বা টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানির সাথে আধা মিলি হারে মিশিয়ে ১২ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

গোড়া পঁচা রোগ

এ রোগের আক্রমণে কান্ড পঁচে যায় এবং ধীরে ধীরে গাছ মরে যায়।

প্রতিকার

- রোগাক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- প্লাবণ সেচ দিয়ে আক্রমণ রোধ করা যায়।
- শস্য পর্যায়ের অনুসরণ করে এ রোগের আক্রণ কমানো যায়।
- বপনের পূর্বে ৪ মিলিগ্রাম এগ্রোসান প্রোড্যাক্স/নোইন/অটোস্টিন দিয়ে প্রতি কেজি বীজ শোধন করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ

ভালো বীজ বা গুনগতমানের বীজ পেতে হলে ফসল যথাসময়ে তুলতে হবে। ফসল সঠিক সময় তুলতে হলে ফসলের পরিপক্কতা সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা থাকা আবশ্যক। চীনা বাদাম বীজ খুবই সংবেদনশীল বা স্পর্শকাতর। কাজেই চীনাবাদাম গাছের শতকরা ৮০-৯০ ভাগ বাদাম যখন পরিপূর্ণভাবে পরিপক্ক হয় তখন বাদামের শিরা-উপশিরাগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। গাছের পাতাগুলি হলুদ রং ধারণ করে নিচের পাতা ঝড়ে পড়তে থাকে। বাদামের খোসা ভাঙ্গার পর খোসার ভিতরে সাদা কালচে দাগ দেখা যাবে এবং বীজের উপরের পাতলা আবরণ বা খোসা বাদামি বা লালচে বা বেগুনি রং ধারণ করলেই বুঝতে হবে ফসল উঠানোর উপযুক্ত সময় হয়েছে। পরিপক্ক হবার আগে বাদাম উঠালে তা হতে ফলন এবং তেল কম হবে। আবার দেরিতে

উঠালে সুপ্ততা না থাকার দরুন জমিতেই অঙ্কুরিত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। শস্য তোলার পর গাছ থেকে খোসাসহ ছাড়ানো বাদাম উজ্জ্বল রোদে দৈনিক ৭-৮ ঘন্টা করে ৫-৬ দিন শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। সাধারণত এ অবস্থায় বীজের আর্দ্রতা ৮-১০% হয়ে থাকে। রোদে শুকানোর পর খোসাসহ বাদাম ঠান্ডা করে উপযুক্ত পাত্রের গুদামজাত করতে হবে। বাদাম বীজ সংরক্ষণের জন্য পলিথিন আচ্ছাদিত বা সিনথেটিক ব্যাগ, চটের বস্তা, মাটির কলসি বা মটকা, কেরোসিন টিন বা ড্রাম বাঁশের তৈরি ঝুড়ি বা ডুলি, পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদি সচরাচর এ দেশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাটির পাত্র ও বাঁশের ডুলিতে বীজ সংরক্ষণের পূর্বে কাদামাটি ও গোবর দিয়ে আস্তরণ দিয়ে নিতে হবে, যাতে বাতাসের আর্দ্রতা পাত্রের ভিতরে ঢুকতে না পারে। আর চটের বস্তার বীজ সংরক্ষণের পূর্বে চটের বস্তার সপরিমাণ মাপের পলিথিন ব্যাগ চটের বস্তার ভিতরে ঢুকিয়ে তারপর পলিথিন ব্যাগে বীজ রেখে পলিথিন ব্যাগ ও চটের বস্তার মুখ ভালো ভাবে বেঁধে বন্ধ করে দিতে হবে যাতে বাইরের বাতাস ব্যাগের মধ্যে ঢুকতে না পারে। এরপর বাদাম বীজসহ বস্তা কাঠের বা বাঁশের মাচায় রেখে দিতে হবে। বর্ষা মৌসুমে (আষাঢ়-ভাদ্র) প্রতি মাসে একবার পরিষ্কার রোদে শুকনো খোলায় গুদামজাত বীজ দৈনিক ৩-৪ ঘন্টা শুকিয়ে ঠান্ডা করে পুনরায় পলিথিন ব্যাগ বা টিনের ড্রামে বীজ সংরক্ষণ করলে বীজের মান বা গুনাগুন নষ্ট হয় না।

নিম্নলিখিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়েও বীজ সংরক্ষণ করা যায়। ঠান্ডা ঘর (কোল্ড রুম) যেখানে তাপমাত্রা ১৮-২০° সে. থাকে এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৪০-৪৫% থাকে সেখানে ১ বছর থেকে ২ বছর পর্যন্ত শুকানো বীজ (৮ থেকে ১০% বীজের আর্দ্রতা) সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায়। ডিপ ফ্রিজ বা অধিক ঠান্ডা ঘর যেখানে তাপমাত্রা ৩-৪° সে. এবং বীজের আর্দ্রতা ৭-৮%, সেখানে বীজ ৩-৫ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

পুষ্টিগুণ

পৃথিবীতে উৎপাদিত বাদামের মধ্যে চীনাবাদাম সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। কাঁচা ও ভাজা তো বটেই মাখন, জ্যাম, চানাচুর, কেক, বিস্কুট, তরকারি, ভর্তা ও তেল তৈরিতে চীনা বাদামের ব্যবহার হয়। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় চীনাবাদামের রয়েছে নানা রকম অবদান। যেমন চীনাবাদামের প্রোটিন দেহ গঠন ও মাংশপেশি তৈরিতে সাহায্য করে। চীনাবাদামের মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এর উচ্চ তাপমাত্রার নিয়াসিন দেহকোষ সুরক্ষা করে, বার্ধক্যজনিত রোগ প্রতিরোধ করে, মস্তিষ্ক সুস্থ রাখে ও রক্ত চলাচলে সহায়তা করে। চীনাবাদাম প্রতিরোধ করে কোলন ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার ও হার্টের রোগ। এতে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে, যা হাড় গঠনেও সহায়ক। চীনাবাদামের মধ্যে আছে প্রচুর আয়রণ। এ উপাদান রক্তের লোহিত কণিকার কার্যক্রম বৃদ্ধি করে। চীনাবাদামের ক্যারোটিন ও ভিটামিন ই ত্বক এবং চুল সুন্দর করে।

বাজারজাতকরণ

নিরাপদ কৃষি পণ্য (চীনা বাদাম) প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সরবরাহের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাধীন গড়েয়া বাজার বাজারে প্রোপাইটর মোঃ আশাদুজ্জামান নূর, ভাই ভাই ট্রেডার্স এ উন্নয়নকৃত নির্ধারিত নিরাপদ কৃষিপণ্য কালেকশান পয়েন্টে ন্যায্য দামে কন্ট্রাক্ট ফার্মার গন বিক্রয় করতে পারবে। অপরদিকে সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার লোকজন এসে নিরাপদ কৃষি পণ্য (চীনা বাদাম) প্রক্রিয়াজাতকরনের উদ্যেশ্যে সঠিক দামে ক্রয় করে নিয়ে যাবে।

মুগডাল

মুগডাল Fabaceae পরিবারের Vigna গণের একটি সপুষ্পক গুল্ম উদ্ভিদ। এই গুল্মটি চাষ করা হয় ডাল হিসাবে খাওয়ার জন্য। কলাই জাতীয় ডালের মধ্যে মুগই প্রধান। মুগডালে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য শক্তি ও প্রোটিন আছে। মুগ, মসুর, মাশকলাই, ছোলা, মটর যেকোনো ডালই হোক না কেন তা শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং উপকারী। তবে নিরামিষভোজীদের জন্য এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খাবার।

উৎপত্তি

মুগের উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, যার মধ্যে, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, চীন এবং কোরিয়ায় মুগের ব্যাপক চাষ হয়। এছাড়াও পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকা, ওয়েস্ট-ইন্ডিজ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ার কিছু অংশে ফলানো হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে মুগডাল উৎপানকারী জেলাসমূহ

বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মুগডালের তিনভাগের দুই ভাগই বৃহত্তর বরিশাল থেকে আসে। শুধু পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলাতেই লক্ষাধিক হেক্টর জমিতে মুগডালের চাষ হয়। মূলত বাংলাদেশের উপকূলীয় জায়গা গুলোতে মুগ ডাল ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে।

পুষ্টিগুণ

নাম	পরিমাণ	নাম	পরিমাণ
ক্যালরি	৩৪৭	প্রোটিন	২৮
লিপিড	১.২ g	vitamin-c	৪.৮ mg
সম্পৃক্ত চর্বি	০.৩ g	লোহা	৬.৭ mg
কোলেস্টেরল	০.০ mg	ম্যাগনেসিয়াম	১৮৯ mg
সোডিয়াম	১৫ mg	ক্যালসিয়াম	১৩২ mg
পটাশিয়াম	১২,৪৬ mg	ভিটামিন ডি	০ iv
শর্করা	৬৩ g	সায়ানোকোবাল	০ mg
খাদ্য আঁশ	১৬ g		

ব্রি.দ্র. প্রতি পরিমাণ ১০০ g এর জন্য ছকটি প্রযোজ্য।

উপকারিতা

১. হজমে সহায়তা করে। শরীরে পরিপাক নালীর মধ্যে যে বিষাক্ত পদার্থ আছে তা বের করে দেয় এই মুগডাল। ফলে হজম শক্তি বাড়ে। এতে নেসিথিন নামে এক ধরনর পুষ্টি উপাদান আছে, যা যকৃতে চর্বি জমাতে বাধা দেয়।

২. ওজন কমায়। এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকায় ক্ষুধা কম লাগে। আর কম খেলে এমনিতেই ওজন কমে আসে। এছাড়া খাবারটিতে কম চর্বি ও উচ্চ মাত্রায় প্রোটিন থাকে।

৩. শক্তির জোগান দেয়। ডালটিতে কার্বোহাইড্রেট থাকায় তা শরীরে শক্তির জোগান দেয় এবং একইসাথে গ্লুকোজের মাত্রাকেও ঠিক রাখে।

৪. ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করে। এতে ভিটামিন বি ১৭ নামে একটি উপাদান আছ, যা ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করে। ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের বেশি করে মুগডাল খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেজ্ঞরা।

৫. ত্বকের জন্য ভালো। এতে ভিটামিন সি থাকায় সহজে শরীরে বার্ধক্যের ছাপ পড়ে না। এছাড়া এতে কোলাজেন এবং ইলাস্টিন উৎপাদন করে যা ত্বকের জন্য ভালো। শুধু ত্বক নয়, খাবারটি নখ ও চুলের জন্য উপকারী। প্রোটিনের পাশাপাশি এত জিংক এবং মিনারেল রয়েছে যা নখ এবং চুলকে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করে।

৬. ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভালো। হজমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য একটি চমৎকার খাবার। রোগের হাত থেকে বাঁচায়।

৭. গর্ভবতী মহিলাদের জন্য মুগ ডালের ব্যবহার উপকারী বলে মনে করা হয়।

৮. শরীরে সঞ্চিত অতিরিক্ত কোলেস্টরল হ্রাস করতে সহায়তা করে।

৯. গরমের দিনে শরীরকে আর্দ্র রাখে। এতে হিট স্ট্রোক এর সম্ভাবনা কমে যায়। এতে আছে অ্যান্টি-ইন-ফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য, আর আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। তাপমাত্রার হাত থেকে শরীরকে বাঁচায়।
১০. রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে। এই ডাল ফাইবার, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ।
১১. হাড় শক্তিশালী করতে সহায়ক। অনাক্রমতা বৃদ্ধি করে।

উৎপাদন ধাপ

মাটি

বেলে দোঁ-আশ ও পলি দোঁআশ মাটি মুগ চাষের জন্য উত্তম। জমিটি হতে হবে মাঝারি উঁচু। মুগের জন্য জলাবদ্ধতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা রয়েছে এমন জমি নির্বাচন করতে হবে (কৃষি তথ্য সার্ভিস এ আই এস)।

জমি তৈরি

জমিতে জো আসার পর ভালোভাবে ৩-৪ টি চাষ দিতে হবে এবং মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। এতে বীজের অঙ্কুরোদগম হার বেড়ে যায়। এছাড়া জমির সকল আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে (কৃষি তথ্য সার্ভিস এ আই এস)।

বপনের সময়

এলাকাভেদে মুগের বপনের সময়ের তারতম্য দেখা যায়। খরিফ-১ মৌসুমে ফাল্গুন মাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারির শেষ হতে মার্চের মধ্যভাগ)।
খরিফ-২ মৌসুমে শ্রাবণ ভাদ্র মাস (আগস্টের প্রথম হতে সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগ)।
রবি মৌসুমে বপনের উত্তম সময় হচ্ছে পৌষ-মাঘ মাস (জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ হতে ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগ)।

বীজের হার

জাতভেদে মুগের বীজের হার ভিন্ন হয়ে থাকে। করিমুগ-২, বারিমুগ-৩ ও করিমুগ ৪ এর জন্য হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি বীজের প্রয়োজন। বারিমুগ-৫ এর জন্য ৪০-৪৫ কেজি বীজের প্রয়োজন। ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ সামান্য দিতে হবে।

বপন পদ্ধতি

ছিটিয়ে ও সারিবদ্ধভাবে বীজ বপন করা যায়। তবে সারিবদ্ধভাবে বপন করাই উত্তম। এক্ষেত্রে সারি হতে সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সে.মি. এবং গাছ হতে গাছের দূরত্ব ১০-১৫ সে.মি. হলে ভালো হয়। বীজের গভীরতা ৩-৪ সে.মি. হলে অঙ্কুরোদগম বেশি হয়।

সার ব্যবস্থাপনা

ফসলের সার সুপারিশ (জাত ভিত্তিক) কেজি/হেক্টর দেয়া হলো:

জাতের নাম	সারের তালিকা					
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক	মলিবডেনাম
বারিমুগ (সব)	৪০	১০০	৬৫			
বিনামুগ-১ বিনামুগ-৩ বিনামুগ-৪	৪০	১০০	৫৫	৭০	৪	২
বিনামুগ-২ বিনামুগ-৫ বিনামুগ-৬ বিনামুগ-৭ বিনামুগ-৮	৪০	১০০	৫৫	৭০	৫	২

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

শেষ চাষের সময় সমুদয় সার প্রয়োগ করতে হবে। অপ্রচলিত এলাকায় আবাদের জন্য সুনিদিষ্ট সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে প্রতি কেজি বীজের জন্য ৮০ গ্রাম অনুজীব সার প্রয়োগ করলে ভালো হয়। অনুজীব সার ব্যবহার করলে ইউরিয়া সারের ব্যবহার করা হয় না।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

মুগডালের ভালো ফলন পেতে হলে ক্ষেতের আগাছা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। ছিটানো পদ্ধতিতে আগাছা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। ছিটানো পদ্ধতিতে আগাছা দমন কঠিন হলেও কাজটি যথাসময়ে করতে হবে। ভালো ফলন পেতে হলে বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে একবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। অতিবৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেক্ষেত্রে পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। খরিফ-১ মৌসুমে বৃষ্টি না হলে বপনের আগে বা পরে একটি সেচ দিতে হবে। সেচ দিলে চারা গজানোর পর মালচিং করে দিতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

খরিফ মৌসুমে বীজ বপনের আগে খরা হলে সেচ দিয়ে জমিতে জো আসার পর বীজ বপন করতে হবে। জমি একেবারে শুকিয়ে গেলে হালকা সেচ দিয়ে নিড়ানি দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি

সাধারণত মুগচাষের সময় সেচের প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টির কারণে জমিতে পানি বেশি জমে গেলে নালা তৈরি করে তাড়াতাড়ি পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জমিতে গোড়া পঁচা অথবা অন্যান্য ছত্রাকে আক্রমণ হলে কোনোভাবেই সেচ দেয়া যাবে না। এমন হলে সেচ দিলে ছত্রাক দ্রুত পুরো জমিতে ছড়িয়ে পড়বে।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ পদ্ধতি

খরার সম্ভাবনা থাকলে সম্পূরক সেচের জন্য জমির পাশে পুকুর করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে।

রোগ

মুগের পাতার দাগ রোগ

সর্কোস্পোরা ক্রোয়েন্টা নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। পাতায় ছোট ছোট লালচে বাদামি বর্ণের গোলাকৃতি হতে ডিম্বাকৃতি দাগ পড়ে। আক্রান্ত পাতা ছিদ্র হয়ে যায়। আক্রান্ত পাতা ঝলসে যেতে পারে। বেশি আর্দ্রতা (৫০%) এবং উচ্চ তাপে (২৮ ডিগ্রী সে.) এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

প্রতিকার

১. ব্যাভিস্টিন নামক ছত্রাকনাশক ১ গ্রাম/লিটার পানি হারে দিনে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

২. রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার (বারিমুগ-২,৩, ৪, ও ৫) করতে হবে।

৩.

মুগের পাউডারি মিলডিউ রোগ

ওইডিয়াম প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। এ রোগে পাতায় পাউডারের মতো আবরণ পড়। বীজ, পরিত্যক্ত গাছের অংশ ও বায়ুর মাধ্যমে রোগ বিস্তার লাভ করে।

প্রতিকার

১. পোষক গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

২. টিল্ট-২৫০ ইসি ১ মিলি/লিটার পানি বা থিওভিট ২ গ্রাম/লি হারে ১০-১২ দিন অন্তর ২-৩ বার স্পে করতে হবে।

হলদে মোজাইক রোগ

মোজাইক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত পাতার উপর হলুদ সবুজ দাগ পড়ে। কচি পাতা প্রথম আক্রান্ত হয়। সাদা মাছি নামক পোকা এ রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে।

প্রতিকার

১. রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার।

২. সাদা মাছি দমনে কীটনাশক প্রয়োগ।

৩. আক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

পোকাদমন

কান্ডের মাছি আক্রান্ত জমিতে কার্বোসালফার জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজ থেকে চারা গজানোর ৩,৭, ১৪, ২১ দিনের মধ্যে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। বিশেষ করে ১ম তিনটি স্প্রে গুরুত্বপূর্ণ (২০ মিলি/৪ মুখ গান সালফেন)। বিছাপোকার আক্রমণ বেশি হলে এমাসেক্টিন বেলজোয়েট জাতীয় কীটনাশক অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। সাদামাছি দমনে ইমিডাক্লোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। জাবপোকা দমনে ইমিডাক্লোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক স্প্রে করতে হবে ২/৩ বার।

ফলন সংগ্রহ

মুগডাল ক্ষেত থেকে সংগহ করা খুবই কষ্টকর। তাছাড়া অনেক জাত রয়েছে যেগুলোর ফল একসাথে পাকেনা তাই কয়েকবারে সংগ্রহ করতে হয়। অন্যদিকে যেসব জাতের ফল একসাথে পাকে সেগুলো একেবারেই সংগ্রহ করা যায়। এক্ষেত্রে ফল পরিপক্ক হলে কাঁচি দিয়ে গোড়া থেকে গাছগুলো কেটে নিতে হবে। এভাবে কাটা হলে গাছে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অত:পর গাছগুলো ভালোভাবে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে মুগডাল সংগ্রহ করা হয়।

মুগডাল বাজারজাতকরণ

বিভিন্ন স্থানীয় প্রক্রিয়ার মুগডাল বাজারজাত করা হয়। গ্রেডিং করে প্যাকেট করার মাধ্যমে আধুনিক বাজারজাত করা হয়।

গুদামজাতকরণ ব্যবস্থাপনা

পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়ই গুদামজাত ডালের ক্ষতি করে থাকে। গুদামজাত করার আগে দানা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হয়। ডালের দানা শুকিয়ে পানির পরিমাণ ১২% এর নিচে আনতে হবে। বীজের জন্য টন প্রতি ৩০০ গ্রাম ম্যালাথিয়ন বা সেভিন ১০% গুড়া মিশিয়ে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। ফসটক্সিন ট্যাবলেট ২ টি বড়ি, প্রতি ১০০ কেজি গুদামজাত ডালে ব্যবহার করতে হয়। এ বড়ি আবদ্ধ পরিবেশে ব্যবহার করতে হয়।

মুগডাল শুধু পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্যই নয়, মুগ গাছের শিকড় মাটির উর্বরতাকে বাড়িয়েও দেয়। মুগ গাছের শিকড় মাটিতে মিশিয়ে দিয়েও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, ফসল ও মাটি উভয়ই ঠিক থাকছে। মুগ ডাল এর জীবনকালও তুলনামূলক কম,

উপাদান সাশ্রয়ী। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের মাটির লবণাক্ততা বাড়ছে। ফসল উৎপাদনের এই সংকট পরিস্থিতি কাটানোর কৌশল হচ্ছে মুগডাল যা সম্ভাবনাময় ফসল (শাইখ সিরাজ থেকে অনুপ্রাণিত)।

দ্রব্যমূল্যের এই সময়ে ডিম, মাছ, মাংসের দাম যেখানে আকাশচুম্বী সেখানে আমিষের চাহিদা তুলনামূলক কম দামে মুগডাল পূরণ করতে সক্ষম। দেশের চাহিদা মিটিয়ে জাপানে যাচ্ছে আমাদের দেশের চাষ হওয়া মুগডাল। কৃষিক্ষেত্রে আমাদের কৃষিবিদদের অবদান অনস্বীকার্য। কৃষকদের কাছাকাছি গিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে মুগডাল চাষ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, প্রযুক্তির ব্যবহার, সঠিক দাম নির্ধারণ, গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নই পারে মুগডাল চাষকে আরো সমৃদ্ধ করতে। আমরা আশাবাদী, শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের কৃষিখাতে সম্পৃক্ততা নতুন করে কৃষি বিপ্লব বয়ে আনতে সক্ষম।

বাজারজাতকরণ

নিরাপদ কৃষি পণ্য (মুগ ডাল) প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সরবরাহের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাধীন গড়েয়া বাজার বাজারে প্রোপাইটর মোঃ আশাদুজ্জামান নূর, ভাই ভাই ট্রেডার্স এ উন্নয়নকৃত নির্ধারিত নিরাপদ কৃষিপণ্য কালেকশান পয়েন্টে ন্যায্য দামে কন্ট্রাক্ট ফার্মার গন বিক্রয় করতে পারবে। অপরদিকে সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার লোকজন এসে নিরাপদ কৃষি পণ্য (চীনা বাদাম) প্রক্রিয়াজাতকরনের উদ্যেশ্যে সঠিক দামে ক্রয় করে নিয়ে যাবে।

মটরশুঁটি

মটরশুঁটি একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু ডাল জাতীয় সবজি, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার হেক্টর (মাঠ ও রোপন ছাড়া) জমিতে চাষ করা হয় এবং প্রায় ১৬ হাজার টন মটরশুঁটি উৎপাদন করা হয়। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চাষের উপকারিতা

১. মটর দানায় শতকরা ৫৯.৬ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ১৯.৯ ভাগ প্রোটিন, ২.১ ভাগ খনিজ, ১১ ভাগ ফ্যাট, ৪.৫ ভাগ আঁশ এবং যথেষ্ট পরিমানে ভিটামিন এ, বি এবং কে রয়েছে।

২. এটি চাষ করলে জমির উর্বরতা বাড়ে।

৩. গো খাদ্য হিসেবে এর খোসা ব্যবহৃত হয়।

জাত

বিভিন্ন ধরনের জাতের মধ্যে আয়কেল, আলাস্কা, গ্রীন ফিস্ট, স্লো ফ্লেক বনভীল, সুগার স্ন্যাপ, বারি মটরশুঁটি-১ বারি মটরশুঁটি-২, বারি মটর শুঁটি-৩ ইত্যাদি জনপ্রিয়।

বারি মটর শুঁটি-১

- এটি উচ্চ ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধী জাত।
- বপনের ৭০-৭৫ দিনের মধ্যে শুঁটি সংগ্রহ করা যায়।
- উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ১০-১২ টন ফলন পাওয়া যায়।

বারি মটরশুঁটি-২

- এই জাতের মটরশুঁটি বেশ নরম হয়।

- এরা পাউডার মিলডিউ ও ডাউনি মিলডিউ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।
- বীজ বপনের ৬৫-৭০ দিনের মধ্যে শুঁটি সংগ্রহ করা যায়।
- উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ১২-১৪ টন হতে পারে।

বারি মটর শুঁটি-৩

১. বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে শুঁটি সংগ্রহ করা যায়।
২. এটি মিষ্টি স্বাদ যুক্ত
৩. ফলন ৮-৯ টন/হেক্টর

চাষ প্রযুক্তি

১. জলবায়ু এবং আবহাওয়া: এটি শীত প্রধান ও আংশিক আদ্র জলবায়ুর উপযোগী ফসল। আদর্শ তাপমাত্রা ১০ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড।
২. মাটি : মটরশুঁটি চাষের আদর্শ মাটি হলো দোঁআশ মাটি। মাটিতে অবশ্যই পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এটেল মাটি চাষের উপযোগী নয়। পিএইচ ৬.৫ থেকে ৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।
৩. চাষের জমি প্রস্তুত করা: মটরশুঁটি গাছের চারা অত্যন্ত দুর্বল হয়। তাই চাষের জমি খুব ভাল ভাবে তৈরি করতে হবে যেন মাটি ঝুর ঝুরে হয়। এজন্য ৪/৫ টি চাষ দিতে হবে এবং মই দিতে হবে। শেষ চাষ দেওয়ার সময় রোটেটরি টিলার এর ব্যবহার করা যেতে পারে। জমি প্রস্তুত করার সময় সকল ধরণের আগাছা, ময়লা আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে হবে এবং সেচ দেওয়ার জন্য নালা প্রস্তুত করতে হবে।
৪. উপযুক্ত জাত নির্ধারণ: কৃষক প্রত্যাশিত ফসল লাভের জন্য জাত নির্ধারণ করবেন। যেমন: মিষ্টি শুঁটির জন্য বারি মটর শুঁটি-৩ চাষ করা যেতে পারে।
৫. বীজের উৎস নির্ধারণ করা: উন্নত মানের বীজের জন্য নিম্ন লিখিত কোম্পানির বীজ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

(ক) ইন্ট্রিগ্রেটেড রেটেড ক্রপ সল্যুশন
(খ) দ্য সোসাইটি নার্সারি
(গ) বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এ্যাসোশিয়েশন
(ঘ) ঢাকা সি ফুড
(ঙ) ইস্ট ওয়েস্ট সিড লিমিটেড
(চ) ভাই ভাই সিড কোং
(ছ) বীজঘর এগ্রো-ফার্ম এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
(জ) কোয়ালিটি সীড কোম্পানি

বীজ শোধন

বীজ বপনের পূর্বে বালাই নাশক দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। Mancozeb 75% wp (2.5 g/1 kg seed) এ প্রয়োগ করে ৭ দিন পর বপন করতে হবে রাইজোবিয়াম কালচার ভাতের ফেনার সাথে মিশিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে বুনতে হবে, এতে গুটির সংখ্যা বাড়বে।

বীজ বপনের সময়

নভেম্বর মাসে বীজ বপন করা ভাল তবে অক্টোবর মাসেও বপন করা যেতে পারে।

বীজের পরিমাণ

১. ছিটিয়ে বপন করলে ১০ কেজি/বিঘা (ধান কাটার ২ সপ্তাহ আগে বপন করা যেতে পারে)।

২. সারিতে বপন করলে ৭ থেকে ৮ কেজি প্রতি বিঘা বীজ প্রয়োজন হয়।

সারি থেকে সারির দূরত্ব ১ ফুট

বীজ থেকে সারির দূরত্ব ৪ ইঞ্চি

মাটির ১ থেকে ৩ ইঞ্চি গভীরে বপন করতে হবে।

আগাছা নিধন

বীজ বপনের ১ থেকে ২ দিন পর আগাছা নিধন করতে হবে। Pendimethalin আগাছা নিধনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। পরবর্তীতে আগাছা নিধনের জন্য নিড়ানি দিতে হবে। তবে সাধারণত আগাছার প্রকোপ দেখা যায় না।

রোগ বালাই নিয়ন্ত্রণ

পোকাঃ মটর গাছে জাব পোকা, লেদা পোকা, গোড়া পোকার ব্যাপক প্রকোপ লক্ষ্য করা যায় । এদের প্রতিহত করতে এন্ডোসালফান ৩৫ ইসি (২ মিলি/১ লি পানি) বা মিথাইল প্যারাথিয়ন ইসি (১-৫ মিলি /১ লি পানি) ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফল ছিদ্রকারী পোকার জন্য Emagectin benzoate 0.9% (25 মিলি প্রতি ১৫ লি পানিতে) ব্যবহার করতে হবে।

রোগ

(ক) পাউডারি মিলডিউ রোগ হলে ছত্রাক নাশক হিসেবে সালফার ৮০% ডাব্লিউ ডি জি (২০ গ্রাম প্রতি ১ লিটার) পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

(খ) ব্রাউন ব্লাস্ট রোগ হলে Propiconazole 25 EC (১ মিলি প্রতি ১ লি) পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

(গ) লিফ স্পট রোগ হলে Iprovalicarb 5.5% ও Propineb 61.25% (৪০ গ্রাম প্রতি ১৫ লি) পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

(ঘ) ব্লাক স্পট রোগ হলে Azoxystrobin (23%) (১.৫ মিলি প্রতি লি) পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

(ঙ) ব্লাক রট হলে Copper oxychloride 50% (৪ গ্রাম প্রতি ১ লি) পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

(চ) রুট রট হলে benomyl ব্যবহার করতে হবে।

*** প্রতিকার হিসেবে রোগের আগেই পানিতে গন্ধক মিশিয়ে কোনান, থায়োভিট ৫.২ শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ বা নকোজেব (যেমন- ডাইথেন এম-৪৫) ০.২৫ শতাংশ স্প্রে সমান ভাবে দিতে হবে।

গাছে ফুল আসা শুরু করলে

- ফুল ঝরে পড়লে PGR হিসেবে tebuconazole + sulfur (10%) প্রতি লিটারে ২ গ্রাম হিসেবে স্পে করতে হবে।
- পাতা পুড়া রোগ হলে Mo (52%) ৫ gm ১৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। Multi micro Nutrient (২৫ গ্রাম/১৫ লিটার) পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

সেচ

মটরশুঁটি জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই ছিটিয়ে পানি দিতে হবে। এজন্য ৮-১০ হাত পর পর নালা তৈরি করে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

২য় বার সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে। কিন্তু ফুল আসলে সেচ দেওয়া যাবে না। সেচ দিতে হবে ২ থেকে ৩ বার।

ফসল তোলা

বীজ বোনার ৯৫-১০০ দিন পর ১ম শুঁটি তোলা যায় এবং ৮-১০ দিনের ব্যবধানে আবার শুঁটি তোলা যায় সবজি হিসেবে এভাবে ৩ থেকে ৪ বার ফল তোলা যায়। ঠিক মত চাষ করতে পারলে একর প্রতি ৮-১০ কুইন্টাল ফলন হতে পারে। কিন্তু ডাল হিসেবে চাষ করলে গাছ হলদে হয়ে শুকিয়ে মারা যাবার পর তা কেটে ফেলে রোদে শুকিয়ে (২-৪ দিন) শুঁটি থেকে দানা আলাদা করতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসুত্র

১. কৃষি প্রযুক্তি হাতবই

২. বিনা উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি পরিচিতি, ৭তম সংস্করণ: জুন ২০২০

৩. কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), www.ais.gov.bd

৪. www.newsbangla24.com

৫. www.agrobangla.com

৬. www.baisc.wordpress.com

৭. http://www.bina.gov.bd/

৮. http://www.bari.gov.bd/

সহায়িকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

বাংলাদেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ডেভলপমেন্ট (বিআরআইডি) জানুয়ারি ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও-৫১০০ এবং লিয়াঁজো অফিস বাড়ি # ৭৪৮, রোড নং: ০৮, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ-এ অবস্থিত। এই ইনস্টিটিউটের মূলমন্ত্র হল "মন এবং বিশ্ব" যা জ্ঞানের অনুসন্ধান এবং বিকাশের জন্য প্রয়োগের পাশাপাশি ব্যবহারিক বিশ্বের সমস্যাগুলি সমাধানের উদ্দেশ্য নির্দেশ করে। এই ইনস্টিটিউটের দৃষ্টিভঙ্গি হল "জ্ঞান অনুসন্ধান এবং প্রয়োগ করে একটি টেকসই বিশ্ব গড়ে তোলা"। এটি উন্নয়ন অঙ্গনে গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। ইনস্টিটিউট সমস্যা সমাধান, চ্যালেঞ্জ প্রশমন এবং বাংলাদেশের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নীতি ও উন্নয়নের উপর আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা পরিচালনা করে। ইনস্টিটিউটটি দেশের এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি প্রকৃত পদ্ধতি গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করে এবং গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নের জন্য নীতিগত পরামর্শ প্রদান করে। উল্লেখ্য যে, ড. সেলিমা আখতার এই ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁহার মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে সুচারুরূপে পরিচালনা করে আসছেন। এই ইনস্টিটিউটটি দুটি বডি নিয়ে গঠিত যথা উপদেষ্টা বোর্ড এবং পরিচালনা পর্ষদ। উপদেষ্টা বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি এবং গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের প্যানেল নিয়ে গঠিত। আর পরিচালনা পর্ষদটি সাতজন সদস্য নিয়ে গঠিত যেখানে চেয়ারম্যান হলেন সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান হলে পদাধিকার বলে সদস্য সচিব। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির বেশ কয়েক ধরনের কর্মী রয়েছে যেমন: স্থায়ী ও নিয়মিত, অস্থায়ী এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মী, যারা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এই ইনস্টিটিউটের কিছু মূল্যবোধ ও নীতি রয়েছে যথা: সততা, সম্মান, উদ্ভাবন, স্বচ্ছতা, বৈচিত্র্য, গুণমান, সমর্থন এবং যোগাযোগ, যেগুলো প্রতিষ্ঠানটির সবাই মেনে চলেন।

প্রক্রিয়াজাত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প